বিপদে বড় চা-বাগানগুলিই। টি বোর্ড বা মজুরি চুক্তি কবে হবে?

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ মে ২০১৭। ১২ টাকা

১২০ বছরের কোচবিহার ক্লাবে আজও সরকারি অনুদান নেই!

হারিয়ে যায় হাড়িয়া-জুয়া-হপ্তার হাট

ডুয়ার্সের নদনদীর ঘাটে ঘাটে

৪র্থ বর্ষে

তরাই জঙ্গলে ইনি কে? বব বিশ্বাস? না কি 'জগ্গা জাসুস'?

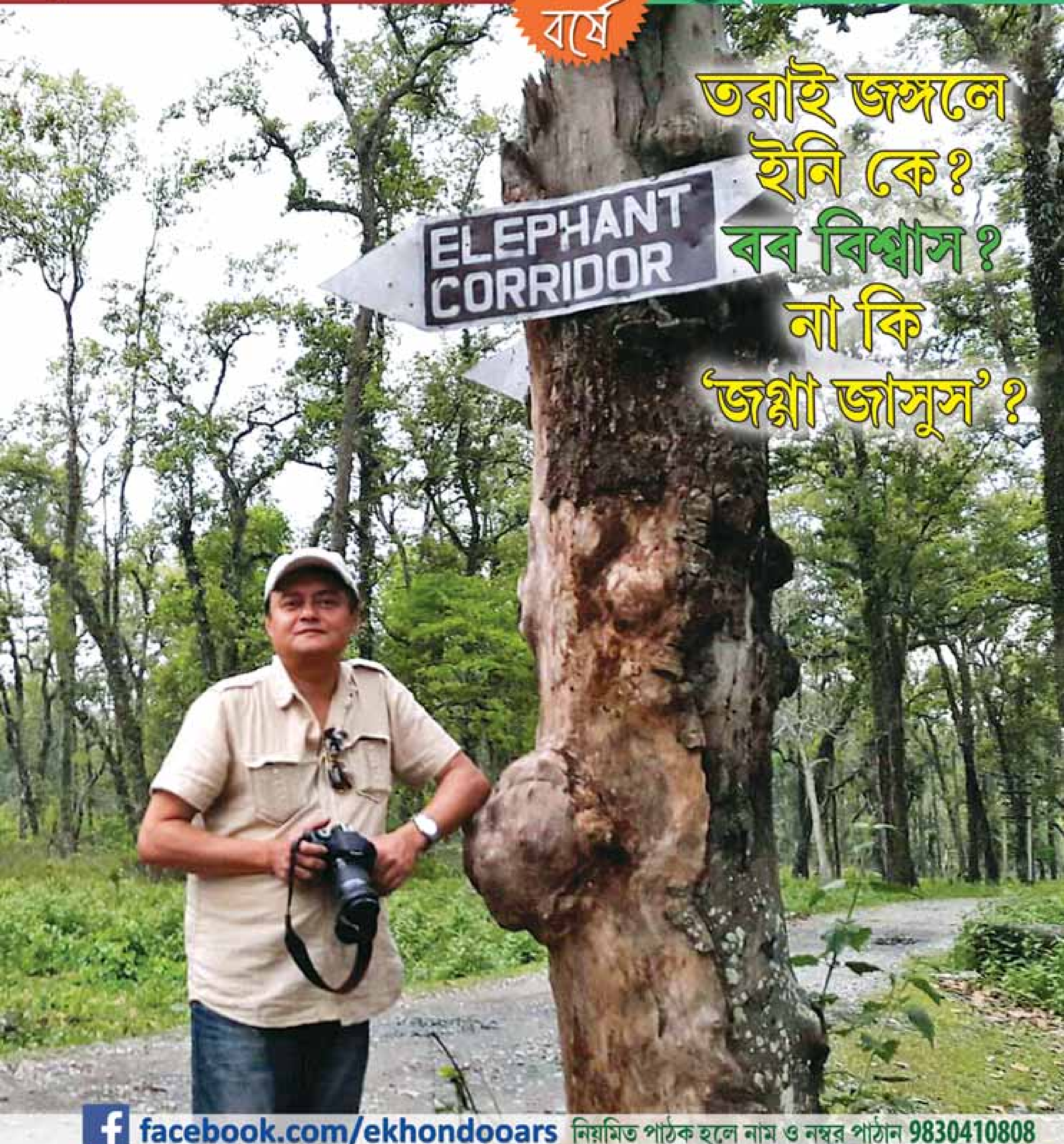

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

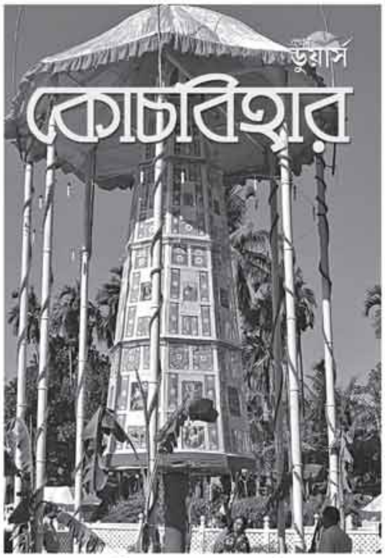

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

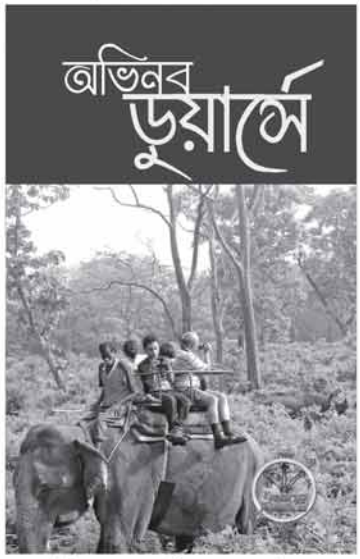

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

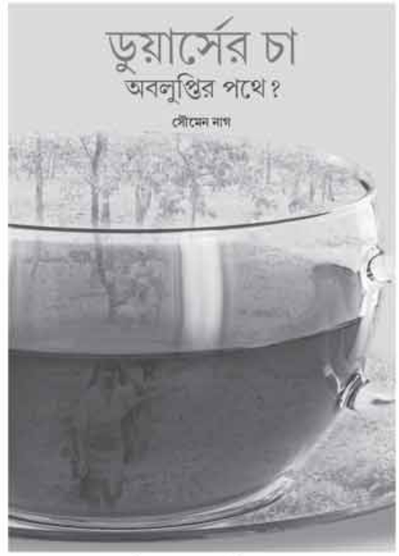

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

লালবাতি যায় নীলবাতি যায় এভাবে কি আর বেঁচে থাকা যায়?

সম্পাদকের ডুয়ার্স

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
আপনি স্যার ভেবেছেনটা কী, ঠিক করে বলুন তো! একবার পাঁচশো-হাজারের পুরনো নোট বাতিল করে দিয়ে জনগণকে খাবি খাইয়ে আপনি যদি নিজেকে সিনেমার 'নায়ক' ভাবতে শুরু করে দেন, যদি ভাবেন সিবিআই জুজু দেখিয়ে সবার পিছনে 'হুড়কো' দেবেন তাহলে একটা কথাই বলতে হয়— কনফিডেন্স থাকা ভাল কিন্তু ওভারকনফিডেন্স বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনার, আমার, সবার।

এই যেমন কয়েকদিন আগে আপনি হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, মন্ত্রী-যন্ত্রী সবার গাড়ি থেকে লালবাতি-নীলবাতি নাকি খুলে ফেলতে হবে! এর মানেটা কী, একটু স্পষ্ট করে বলবেন স্যার? এত দিনের 'রীতি-রেওয়াজ-ঐতিহ্য' সব একদিনে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন? এর আগে সর্বোচ্চ আদালত থেকে নির্দেশ জারি করেও যা করা সম্ভব হয়নি তা আপনি করে দেখাবেন? আপনি কি নিজেকে আদালতের থেকেও বড় ভাবেন নাকি? আপনার কি আর কোনও কাজকম্ম নাই?

স্যার, আপনিও তো এর আগে বিধায়ক ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন— তখন আপনার গাড়িতে লালবাতি লাগাননি? হুটার বাজিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে যাতায়াত করেননি? এখন আমরা যখন একটু-আধটু করার সুযোগ পেয়েছি, তখন আপনার গায়ে জ্বালা ধরে গেল? আপনি জানেন, ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমিও মন্ত্রী হব, লালবাতি জ্বালিয়ে হুসহাস এদিক-ওদিক যাতায়াত করব। বহুদিন পর আমাদের দল যখন ক্ষমতায় এল, অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলাম, জানেন। কিন্তু মন্ত্রীর লিস্টে নাম নেই দেখে মনটা ভীষণ ভেঙে গিয়েছিল। এর পর সান্ত্বনা দিতে একটা নীলবাতির ব্যবস্থা হল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সে চাকরিও গেল। দল থেকে এর পর একটা লালবাতির ব্যবস্থাও হল বটে, কিন্তু কপালটাই খারাপ, কোর্টের রায়ে সেই পদও 'অবৈধ' ঘোষণা হল। এর পর পাঁচ বছর বাদে আবার জিতে আসার পর 'উপরওয়ালা' মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু বছরখানেক ব্যাপারটা ঠিকঠাক উপভোগ করতে না করতেই আপনার ফতোয়া!

আপনাকে কীভাবে বোঝাই স্যার, যখন মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর চামচেরা কোনও পাত্তা দেন না, যখন আমলারা পর্যন্ত আমাদের 'অশিক্ষিত ফেকলু' ভাবেন, তখন দলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চালাতে গেলে এই লালবাতি বা নীলবাতিই আমাদের ভরসা! আর আমাদের আম জনতা? এই বাতি না জ্বললে ওরা আর সমঝে চলবে আমাদের? সে আপনার দল হোক বা আমার দল, সমস্যাটা কিন্তু একই স্যার। মানুষ তো এমনিতেই আমাদের উঠতে-বসতে বাপ-বাপান্ত করে, কিন্তু বুকে হাত রেখে বলুন তো স্যার, আমাদের মতো নিচুতলার নেতা না থাকলে কোনও দল চলে?

আপনার নির্দেশ অনুযায়ী স্যার এখন থেকে গাড়িতে লাল-নীলবাতি জ্বলবে কেবল অন ডিউটি পুলিশ কিংবা রুগি নিয়ে ছুটতে থাকা অ্যাম্বুলেন্স! এর কি কোনও প্রতীকী অর্থ আছে স্যার? এর পিছনে আবার আপনার কোনও বিদঘুটে অভিপ্রায় লুকিয়ে নেই তো? যেমন আমাদের মতো নেতারাও কেবল তখনই লাল-নীলবাতির গাড়িতে চড়তে পারবে, যখন পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবে কিংবা যখন খেপিয়ে তোলা জনগণের প্যাঁদানিতে ক্যাতরাতে ক্যাতরাতে আধমরা হয়ে হাসপাতালে ছুটতে হবে!

বুকে অনেক ব্যথা-অভিমান নিয়ে আপনাকে এই খোলা চিঠি। একে আবার ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না স্যার! চাইলে আমার বায়োডাটা পাঠিয়ে রাখতে পারি। আমাদের এলাকায় আপনার দলের তো তেমন কোনও 'বলিষ্ঠ' নেতা নেই! সেই জন্যই অধমের দেশসেবার এই 'ক্ষুদ্র অফার' রইল। আপনি ভাল থাকুন, আমাদেরও ভাল রাখুন। নমস্কারসহ
আপনার দেশের এক কোণের এক অভাগা মন্ত্রী।

চতুর্থ বর্ষ, ৪থ সংখ্যা, ১৬-৩১ মে ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১০
বেশি বিপদে বড় বড় বাগানগুলোই আজও চালু হল না টি বোর্ড বা ন্যুনতম মজুরি চুক্তি
উত্তরপক্ষ ২০
হারিয়ে যায় হাড়িয়া-জুয়া-হপ্তার হাট গ্রামীণ ডুয়ার্সের মিলনমেলা
পর্যটকের ডুয়ার্স ২২
অপুর সঙ্গে চুটিয়ে চারটে দিন
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ১৭
সদস্য চাঁদা আজও মাসে দশ টাকা রাজ ঐতিহ্য নিয়েও মলিন কোচবিহার ক্লাব
পর্যটকের পরিক্রমা ৪০
ডুয়ার্সের ঘাট বৃত্তান্ত
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২
তরাই উৎরাই ৩৫
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৭
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৫
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৮
শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
এবারের শ্রীমতী ২৭
কোমর ও হাঁটু সচল রাখাটা জরুরি ২৮
নিজলয় হোমে শ্রীমতীরা ৩০
নেতাজির স্মৃতিজড়িত হারমোনিয়াম! ৩১

প্রচ্ছদ ছবি: দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

হযবরল 'ল'

পরীক্ষা ছিল আইনের। কিন্তু কতিপয় হবু আইনজীবীর খাতা দেখে পরীক্ষকদের মাথার চুল সেই যে সমকোণে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর নামছেই না। খাতা জুড়ে কোথায় আইনের ফাইন ব্যাখ্যা? বদলে কোথাও আস্ত হিন্দি গানের লিরিক, কোথাও বিচ্ছিরি ধরনের প্রেমপত্র, কোথাও আবার দিন কেমন কাটছে— তার ফিরিস্তি! পরীক্ষকরা অবশ্যি দণ্ডদানে এক দণ্ড দেরি করেননি। কিন্তু ফেল করে সে কী হম্বিতম্বি পড়ুয়াদের! শেষে সাংসদ ময়দানে নেমে ঘোষণা করেছেন, কোনও ক্ষমা নয়। এক্কেবারে নন বেলেবল ফেল করিয়ে দেওয়া হোক অপদার্থদের! ফলে সাসপেন্ড! শোনা যাচ্ছে, ১৮২ জন পরীক্ষা দিলেও সব বিষয়ে পাশ করেছে মোটে ২৫ জন। আর পরীক্ষার খাতায় প্রেমপত্র লিখে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ডের সংখ্যা ১০। তা 'ল' পরীক্ষায় এমন হযবরল ঘটাল কেন ওই দশজন? অভিজ্ঞরা বলছেন, সময়মতো টুকলি আসেনি বলেই ঘটেছে এসব। হুম! কালো কোটের কলঙ্ক! বালুরঘাটে।

আলু আঁধার

সাধ করে গাঁট থেকে বেশি পয়সা খচ্চা করে জামালদহের কয়েকজন 'হাই-ফাই' বীজ কিনে ভেবেছিলেন যে জমকালো আলু ফলাবেন। দেখে পড়শির চোখ যাবে বেঁকে। কচি কচি আলুপাতা খেতের উপর ডানা মেলতে শুরু করায় তাঁরা আনন্দে অধীর ছিলেন। গাছ গজাল দিব্যি। তারপর শুভদিন দেখে মাটি খুঁড়ে আলু তুলতে গিয়ে পড়শির বদলে নিজেদের চোখই বেঁকে গেল। মাটির নিচে এসব কী? আলু, কিন্তু আলু নয়। দেখতে আদার মতো। চোখ রয়েছে কয়েকজোড়া করে। সেই বিচিত্র আদালু দেখে ক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে ভাগলবা! গোরু-ছাগলরা অবশ্য সোনামুখ করে খেয়ে নিচ্ছে, কিন্তু তারা তো পয়সা দেবে না! সব দেখে প্রশাসন বলছে বীজ কেনার রসিদ নিয়ে যোগাযোগ করতে। জোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ট্যাক্স দেওয়ার ভয়ে রসিদই বা কে দেয় আর কে-ই বা নেয় গ্রাম-ডুয়ার্সে?

চালাক বাঘু

আমগুড়ির কাছে সেই চা-বাগানের পাতারা সাবালক হয়ে গিয়েছে। তাদের চটপট তুলে চা বানিয়ে ফেলার জন্য শ্রমিকরাও রেডি। কিন্তু সমস্যা হল, বাগানে পাতা তুলতে গেলেই দেখা যাচ্ছে ওনাকে। লেজ নাড়িয়ে গরগর শব্দে তিনিও পাতা তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলেই মালুম শ্রমিকদের। তা চিতার সঙ্গে পাতা তোলা কি চাট্টিখানি কাজ রে বাপৈ! ফলে গাছের পাতা গাছেই। খাঁচা পেতে চিতাবাবুকে ধরার চেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কিছুতেই খাঁচার ছাগলে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না বাঘুবাবু। মনে হয়, ছাগলে অরুচি জন্মে গিয়েছে। আর ভারী আশ্চর্য যে, বন দপ্তরের লোকেরা এলে চিতাবাবু ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। তা দিনকাল ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে। এই জেনারেশনের বাঘুরা তো বুদ্ধিমান হবেই। খচ্চা করে ছাগলের বদলে পাঁঠা না দিলে চলবে?

রংবাজি

পঞ্চাশ বছর ধরে ছাত্রীরা পরছে লাল পাড়ের শাড়ি আর ছাত্ররা কালো প্যান্ট। লাল-কালো রং নিয়ে সমস্যা ছিল নাকো এদ্দিন। হঠাৎ কী খেয়ালে লাল পাড় আর কালো প্যান্টকে নীল বানিয়ে দেওয়ার জন্য আদা-জল খেয়ে নেমে পড়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে ধুন্ধুমার প্রতিবাদ চলছিল। শেষে রাগে আটটা হয়ে স্কুলের টিচার-দিদিমণিদের ঘরে আটকে তালা দিয়ে দিলেন অভিভাবকরা। তা তাঁদের খেপে যাওয়ার কারণ আছে বইকি! রং বদল নিয়ে মিটিং-এর পর মিটিং ডেকে পরিচালন সমিতির কাউকে পাওয়া যায় না। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও কেমন জানি উদাসীন ভাব করে গরহাজির থাকেন। হাজার প্রতিবাদের পরেও পড়ুয়াদের নীল পাড়ের শাড়ি আর নীল প্যান্ট গছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন রে? নীল-সাদার প্রতি এহেন আদিখ্যেতার কী মানে? তা গার্জিয়ানদের রংবাজি নিয়ে অবশ্যি স্কুল কমিটি এক্কেবারে চুপ!

গন্ডারিয়া

গোরুমারায় দুটো গন্ডারের শহিদ হওয়া নিয়ে কম হইচই হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, মণিপুরের জঙ্গিরা নাকি গন্ডার হত্যা করে শিং কেটে পালিয়ে গিয়েছে। খবর জেনে বন মন্ত্রী রেগে আগুন, তেলে বেগুন! সাসপেন্ড ইত্যাদি সেরে ফেলেছেন তিনি। এদিকে বনরক্ষীরা বলছে, চারফুটি বেতের লাঠি নিয়ে চোরাশিকারিদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া অসম্ভব। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ির সঞ্জীববাবু গোরুমারার জঙ্গলে পুরোহিত নিয়ে গন্ডারদের শ্রাদ্ধও করে ফেলেছেন। পুরোহিত অবশ্য গন্ডারের গোত্র নিয়ে টেনশনে ছিলেন। তা সঞ্জীববাবু জানিয়ে দিয়েছেন, 'গন্ডার নির্বিবাদী গোত্র।' সেটা মেনেই শ্রাদ্ধশান্তি করে এলাকার লোক আর বেড়াতে আসা পর্যটকদের দই-চিঁড়ে খাওয়ানো হয়েছে সে দিন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হাজির থাকা পাবলিক অবশ্য তেড়ে গালাগালও দিয়েছে বন বিভাগকে। দেওয়ারই তো কথা!

খাড়ার সাড়া

গন্ডারে যখন চলেই এলাম, তখন জানিয়ে রাখি যে ডুয়ার্সে এখন তারাই খবরে। এই সে দিন মুখ্যমন্ত্রী এসে ভারী দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তা ডুয়ার্সের গন্ডার শিরোমণি খাড়া সিং এর মধ্যে বন বিভাগকে নাকের জলে চোখের জলে করে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন। অরণ্যের কোনও সিসি ক্যামেরায় তার ছবি নেই। কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছিল নাকো! তাহলে কি চোরাশিকারির হাতে শহিদ হল বেচারা? যে দুটোর বডি

পাওয়া গিয়েছে, তার একটা খাড়া নয় তো? তারপর একদিন দপ্তর জানাল, খাড়া মিল গয়া! এই দেখো ভিডিয়ো! কিন্তু খাড়ার দোপেয়ে বন্ধুরা ভিডিয়োর গন্ডারকে খাড়া বলে মানতে রাজি নয়। এই নিয়ে ধুন্ধুমার হুলুস্থুলু! শেষে অবশ্যি সাড়া পাওয়া গিয়েছে খাড়ার। দিব্যি আছে সে শিং নিয়ে। তবে কোথায় ভ্যানিশ হয়েছিল তা বলেনি। বনতন্ত্রে চারপেয়েরা কিছু বলতে বাধ্য নয়— বুয়েচেন? বেশ।

কী কাণ্ড

চোদ্দো বছরের মেয়ে ভ্যানিশ। পুলিশ উঠে-পড়ে লেগেছে ঠিকই, কিন্তু মেয়ে যেন উবে গিয়েছে! তাহলে কি বিয়ে করে পালিয়ে গিয়েছে? নাহ্! তেমন কোনও সংবাদ নেই। পাচার হয়ে যায়নি তো? সে নিয়েও নিশ্চিত হতে পারছে না থানা। বাপ-মা মন্ত্রীমহলে চিঠি লিখলেন। পুলিশের দৌড়াদৌড়ি আরও বেড়ে গেল, কিন্তু মেয়ে ভ্যানিশ! তা কথায় বলে, ফ্রি মনে কাজ করতে পারলে পুলিশ ভূতকেও ধরে আনতে পারে। ভ্যানিশ মেয়েকে পাওয়া গেল

শিলিগুড়িতে। বেশ আহ্লাদের সঙ্গে এক মাড়োয়ারি পরিবারে পরিচারিকার কাজ করছে। পুলিশ দেখে সে বলে দিল, 'গো ব্যাক টু হোম। কভি নেহি! আমাকে ফাঁসি দিন! কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে পাঠাবেন না!' শুনে পুলিশ একটু খাবি খেলেও 'বাছা রে, সোনা রে' বলে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে বালিকাকে। বাপ-মাকেও খুব বুঝিয়েছে তারা। যাক! ঘটনা জলপাইগুড়িতে।

পোকা প্রোটিন

আহা! ভারী সাধ করে ওজন বাড়ানোর ওষুধ কিনেছিল মালবাজারের যুবক। পাটকাঠি মার্কা চেহারায় গত্তি আনতে ভারী ভরসা করেছিল এক পাউডারে। সে পাউডার নাকি প্রোটিনের খনি। উচ্চমানের প্রোটিন, খেলেই কঠিন হবে শরীর। পেশি হবে সলমান খানের মতো আর গায়ের জোরে বাঁটুলও হার মেনে যাবে। মাস তিনেক খাওয়ার পর শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইকের উপর বসে থাকলেই হবে। গার্লফ্রেন্ডরা এসে কূল পাবে না। তবে খচ্চা একটু বেশি। মানে বেশি বেশিই বেশি। তা বেশি খচ্চা করে পাউডার কিনে বাড়িতে এসে চামচ এনে কৌটো খুলে সেবন করতে গিয়ে বেচারা যুবক প্রায় মূর্ছা যায়। পাউডারময় দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে পোকার দল। একেবারে জ্যান্ত প্রোটিন যাকে বলে। অতঃপর প্রতিবাদ। ফলে ওজন ধ্রুবক হয়েই আছে যুবকের।

টুক্রাণু

জলপাইগুড়ির ডাঙাপাড়ায় ছিপ দ্বারা পুকুর থেকে দশ কিলোর সিলভার কার্প উত্তোলন। হাতিরা এখন রাজাভাতখাওয়ায় গুন্ডামি করছে। কোচবিহারে পাটছড়া গ্রামে রাস্তা তৈরি দশ বছর আগে শুরু হলেও এখনও শেষ হয়নি। ডুয়ার্সে অক্ষয়তৃতীয়ায় পুরোহিতদের বাজার খুব খারাপ গেল। পাহাড়ের পুর ভোটে মোর্চার খাবি খাওয়ার খুব সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খেলনা লুঠ রায়গঞ্জে। হাই টেনশন লাইনে গুঁতো খেয়ে চালসায় প্রয়াত পেঁচা। টাকার দাবিতে ব্যাঙ্ক অবরোধ পুন্ডিবাড়িতে। ঝাড় শালবাড়ির প্রাইমারি স্কুলের ক্লাসরুমে একটি মেধাবী সাপের অনুপ্রবেশ। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন যে তিনি নন-রোবট। গাজলের হরিচরণ বারো হাজার টাকায় ড্রোন ক্যামেরা বানিয়ে ফেলেছে। মাত্র উনিশ বছর ধরে টোটোপাড়ায় যায় না সরকারি বাস। ডুয়ার্সে দেখা যাচ্ছে পথনিরাপত্তার বিচিত্র স্লোগান, সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ! বিজেপি কর্মীকে নর্দমায় ফেলে দিল চাউলহাটির বেয়াদব গোরু।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

জ্যৈষ্ঠ্যের গৌরব আম বাংলার শৈশব

ঘটি বাড়িতে আমকে 'আঁব' বলতে শুনলেও আমরা যারা ডুয়ার্সে বসবাস করি, আমরা বরাবর কোদালকে কোদাল বলার সঙ্গে আমকে আমই বলে এসেছি। বহু বছরের দূরত্ব সরিয়ে আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসের বিশেষ একটি দিনে ঠাকুমা ভিজে হাতপাখার সঙ্গে দু'আঙুলে একটা পাকা আম ঝুলিয়ে বাতাস দিতেন আমাদের আর ষাট ষাট বলতেন। নীলষষ্ঠীর দিন শিব ঠাকুরের মাথায় পাকা বেলের সঙ্গে আঁটি সমেত কাঁচা আম চড়াতে দেখে বেশ আমোদ হত। এমন গুমট গরম পড়ত সে সময়, যে ডুয়ার্স জুড়ে উশখুশানি শুরু হত প্রবল একখানা কালবৈশাখী চেয়ে। আমাদের দহনদগ্ধ আকুতিতে সাড়া দিত প্রকৃতি। প্রচণ্ড ঝড়ে মাটিতে বিছিয়ে থাকত ঝরে যাওয়া মাঝারি সাইজের আম। সেগুলোকে বলা হত গুটি।

শিলাবৃষ্টি আর আম কুড়ানোর ঝড় আজও আমাদের মনের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ তোলে। এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাই আমাদের বাড়ির পিছন দিকে আম গাছ ভরতি কাকের বাসা থেকে টুপটাপ করে ঝরে পড়েছে ডিম। মা-পাখিদের ওড়াউড়ি আর কাতর কা-কা মিশে যাচ্ছে ঝড়ের দাপটে। গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে বাস্তুসাপ বা গোখরো।

জ্যৈষ্ঠের প্রবল প্রতাপকে ফিকে করে দিয়ে ঠিক দুপুরবেলা ঘন কালো মেঘ যখন ঝুঁকে এসে দাঁড়াত আম গাছের মাথায়, তখন পাতাগুলো কালচে হয়ে গেলেও সাদাটে রঙের ঝুলন্ত আম নজরে আসত। ঝড়ের দাপট সামলে যে ক'ঝুড়ি গাছে রয়ে যেত, তার কিছু সংখ্যক চলে যেত কাঁচা আমের নানা পদে। বাদবাকি পাকা আমে চলে যেত আরও মাস দুই, আনারস ওঠার আগে অবধি। এ সময়েই তো পাল্লা দিয়ে ফলে লিচু, করমচা, জামরুল। তবে এদের তুলনায় আমের মেয়াদ বেশি। এখনও দফায় দফায় আম ওঠে ডুয়ার্সের বাজারে। নানা স্বাদের, নানা মাপের সেসব আম।

আমের ভুবন বৈচিত্রের ম্যাজিক দিয়ে সাজানো। কেননা চাষি থেকে মহারাজা— কে না আকৃষ্ট হয়েছেন আমের রূপে, রসে, গন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে তৈরি করেছিলেন অমোঘ চিত্রকল্প— 'পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে/ মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে'। রবীন্দ্রনাথ এক অসাধ্যসাধন করেছেন, আম্রমঞ্জরিকেও করবী, মাধবী, মালতীর মতো ফুল হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়ে। আমের ব্যাপারে তাঁর এই আসক্তি বা অনুরাগ রোমান্টিসিজম ছাপিয়ে বিশেষ এক বাস্তব পরিণতি পেল, যখন মধ্যবয়সে তিনি প্রিয়াকে অনুরোধ করলেন, 'অরুণ বরণ আম এনো গোটা কত।'

আমাদের বাড়ির পিছনে ছিল মুখার্জিদের বাগান। সে বাগানে মুখার্জিদাদু নিজেই মাটি নিড়িয়ে বিভিন্নরকম ফুল ফোটাতেন, ফলাতেন ফল। বাগানে আম আর কাঁঠাল গাছ ছিল কয়েকটা। মায়ের যত্নে লালন করা হত সেই গাছগুলোকে। একজন গাছি আসত কোত্থেকে যেন। আম গাছগুলোর তদারকি, সন্ধেবেলা বাদুড় তাড়ানোর ব্যবস্থা, গোড়ার কাছ থেকে অনেকটা জায়গা জুড়ে গোবরমাটির জল ছড়াতে দেখতাম। পুরো পেকে খসে যাওয়ার আগে আমপাতা সাজিয়ে সাজিয়ে আম পেড়ে, ঝুড়ি ঝুড়ি গুছিয়ে রাখা হত। এত আদরযত্নে আমগুলোও আপ্লুত হয়ে যেত, রাঙা হত নববধূর সিঁদুরে ব্রীড়ায়।

এই ডায়েরি যখন লিখছি, তখন বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ আসার সময় হয়ে গেল। বৈশাখ মানেই তো দোকানে দোকানে হালখাতা, দেওয়ালে হলুদ সিঁদুরের ফোঁটা, সুতলি দড়িতে আমপাতা গেঁথে গেঁথে দরজার মাথায় সাজানো। তার সঙ্গে বেলা বাড়লে টাটকা সন্দেশের সঙ্গে আমপোড়ার শরবত। কখনও বা চ্যাঙারি করে বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি করতে আসা কাঁচা ও পাকা আমের গড়নের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

আমবাগান একটা দেখবার মতো জিনিস বটে। বেলাবেলি যদি কখনও রেলে চেপে ফারাক্কা ব্রিজ পার হই তাহলে আগে থেকেই ট্রেনের জানলা দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাইরের দিকে। বাইরে রেললাইনের দু'ধারে বিস্তীর্ণ আমের বাগান। মালদার বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন গ্রামে নানা ধরনের নানা স্বাদের ও নানা বৈচিত্রের আম জন্মায়। আড়াইশোরও বেশি প্রজাতির আম মেলে মালদায়। বাগিচা ফসল হিসেবে এই অঞ্চলে আম অগ্রগণ্য। প্রতি বছর প্রায় পঁচিশ হাজার হেক্টর এলাকায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়। মহানন্দা, কালিন্দী ও টাঙ্গন— এই তিন নদীর ধার ঘেঁষেই ঘরে উঠেছে আম উৎপাদক অঞ্চল।

সেই আমবাগানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাই। মনের চোখ দিয়ে দেখি, চারদিকে ঘন আম গাছের জঙ্গল। গাছগুলোর বড় বড় ডাল, মোটা মোটা কাণ্ড। ভিতরে ঢুকে পড়লে আকাশ দেখার জো নেই। গাছ ভরতি পাতা এই অরণ্যকে আরও দুর্ভেদ্য বানিয়ে রেখেছে। জংলা গন্ধ ছাপিয়ে নাকে আসছে সুগন্ধ।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলনে কেরি। সামনেই একটা ছোট্ট জলাশয়। বড্ড গরম পড়েছে। মুখে-চোখে একটু জল দিলে আরাম পাওয়া যাবে। দলবল নিয়ে বেরিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি। এদিকে বন্য জন্তু তো আছেই, ডাকাতের উপদ্রবের কথাও সুবিদিত। কেরি শুনেছেন এই তাল্ডুমরা নদীর পাশেই মদনাবতীর গ্রাম। কেরির লক্ষ্য এখন সেই গ্রাম। সেখানেই তাঁকে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

অষ্টাদশ শতক ফুরাবে ফুরাবে করছে। জাহাজের ডাক্তার টমাস কেরির মতোই বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে খুঁজে চলেছেন মিশনারির জন্য একটি নিরুপদ্রব স্থান। আম গাছ দিয়ে ছাওয়া মদনাবতীকেই প্রাথমিকভাবে বেছে নিলেন কেরি। সঙ্গে নিয়ে আসা মুদ্রাযন্ত্রটিও স্থাপিত হল এখানে। দুর্গম এই স্থানে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে হলেও কয়েকদিনেই এক আশ্চর্য ফলের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। মধুর সেই ফলের রস। অমৃত ফল আমের এই বিস্তীর্ণ উৎপাদনভূমি ছেড়ে শেষে কেরিকে পাড়ি দিতে হয় শ্রীরামপুরের উদ্দেশে।

বাংলায় ইলিয়াস শাহি বংশের পতনের প্রায় ছয় বছরের হাবসি শাসনে এক ভয়ংকর অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতি। লখনাবতীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হয় আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনের সময়।

বঙ্গদেশের রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে একডালাতে সরানোর পাশাপাশি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ উদারতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা একমাত্র মোগল সম্রাট আকবরের আগে অন্য কোনও মুসলমান সুলতানের মধ্যে পাওয়া যায়নি। হুসেন শাহি বংশের শাসনকালে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের পাশাপাশি সংস্কৃতিরও সমন্বয় ঘটেছিল পূর্বের ইলিয়াস শাহি বংশের পদাঙ্ক অনুসরণে। ফলে বাঙালির সার্বিক রুচি ও খাদ্যাভ্যাসও অনেকটাই প্রভাবিত হয় এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে। তারই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জাতের, আকারের, বর্ণের ও স্বাদবৈচিত্রের অমৃত ফল আমদানি করা হয় এখানে।

বঙ্গদেশের অধুনাবিলুপ্ত রাজধানী গৌড়ের অদূরে অবস্থিত রামকেলি গ্রামে ওই হুসেন শাহের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। হুসেন শাহের রাজসভায় দু'জন সচিব রূপ ও সনাতন গোস্বামী। এঁরা দুই ভাই পরে বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর অনুগামী হবেন। প্রায় সাতশো বছর আগে রামকেলি বা গুপ্ত বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যর আগমনপথে গৌড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে যে আম্র বৃক্ষের তলে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং সেই বৃক্ষের ফল আস্বাদন করেছিলেন, আজ তার নাম বৃন্দাবনি আম গাছ। তার সামনের প্রশস্ত মাঠের নাম বৃন্দাবনি ময়দান।

এখনও প্রত্যেক বছর জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তিতে বিরাট বৈষ্ণব মেলা বসে ওই গুপ্ত বৃন্দাবন তথা রামকেলিতে। ঘন আমবাগানের মধ্যে রাধাকুণ্ড ও কৃষ্ণকুণ্ড নামে দুটো পুষ্করিণী। পাশে মদনমোহন মন্দির। মন্দিরের প্রবেশপথে একটি তমাল বৃক্ষ। তার পাশে এক টুকরো মন্দির। তার ভিতর আছে কষ্টিপাথরের উপর মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ। ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণবরা দূরদূরান্ত থেকে কয়েকশো বছর ধরে এই বিশেষ দিন ওখানে জড়ো হন। জনশ্রুতি, বাংলার প্রথম মিছিল এখান থেকে শুরু হয়েছিল। এখান থেকেই নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

আম মরশুমি ফসল। সারা বছর আম উৎপাদিত হয় না। অসময়ে যেসব আম জন্মায়, মরশুমে জন্মানো আমের চেয়ে তার প্রকৃতি ও স্বাদ আলাদা। এই প্রকৃতি, স্বাদ ও মানভেদে আমের নামকরণ হয়ে থাকে। সাধারণত রাজা-বাদশাহের দেশ মালদায় নিজেদের মর্যাদা ও বৈভব বাঁচিয়ে রাখতে একসময় যেমন তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে নানা স্বাদ ও গন্ধের আম নিয়ে এসে নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখতেন, তেমনই এই অঞ্চলের সহজলভ্য যে আম, তার ফলন অতীতের মতো আজও সমান।

আমের নামকরণের পিছনে নানা কারণ থাকে। ফজলি, রাখালভোগ, লখনা, হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোপালভোগের মতো সুপরিচিত আমের পাশাপাশি জাহাঙ্গির, আমির পসন্দ, বেগম পসন্দ, জর্দালু, দোফলা, জগৎবেল, আশ্বিনা, কাঁচামিঠা, মির্জা পসন্দ প্রভৃতি আম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোনও কোনও আমের একটি ওজনই এক কেজি। যেমন 'হুক্কা'। আবার কোনও কোনও আমের ওজন একশো গ্রামেরও কম। যেমন 'শপেদা'।

আমের নামকরণের পিছনে নানা কারণ থাকে। ফজলি, রাখালভোগ, লখনা, হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোপালভোগের মতো সুপরিচিত আমের পাশাপাশি জাহাঙ্গির, আমির পসন্দ, বেগম পসন্দ, জর্দালু, দোফলা, জগৎবেল, আশ্বিনা, কাঁচামিঠা, মির্জা পসন্দ প্রভৃতি আম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোনও কোনও আমের একটি ওজনই এক কেজি। যেমন 'হুক্কা'। আবার কোনও কোনও আমের ওজন একশো গ্রামেরও কম। যেমন 'শপেদা'। মালদার গ্রামাঞ্চলে নানারকম গুটি আমের চাষ হয়। বৈশাখ মাসে যে গুটি জন্মায়, তার নাম বৈশাখ্যা গুটি। অন্য দিকে শ্রাবণ মাসে যে গুটি আম জন্মায়, তাকে বলা হয় শাওনাই গুটি। এ ছাড়াও যেসব আমের পেটের অংশ পাকা অবস্থায় আলতার মতো লাল হয়ে যায়, তাকে বলে আলতাপেটি।

আমাদের বাড়ির পিছনের সেই মুখার্জিদাদু বহু বছর আগে চোখ বুজেছেন। তাঁর ছেলেরাও মারা গিয়েছেন। বসতবাড়ি সমেত বাগানটাও প্লট করে বিক্রি করে দিয়েছেন ওঁরা। সেখানে গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। সেই আম গাছগুলো আর নেই, যেখানে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে উড়ে বেড়াতে দেখত ঝাঁক ঝাঁক পাখি। চৈত্রের মঞ্জরির মেহেদি রঙে দেখা যেত ফলন্ত আভাস। যুগের দাবিতে সেই আম গাছগুলো এখন নিশ্চিহ্ন। ভাঁটিবন, ঝুমকো জবা, আঁশফলের মতো আম গাছও হয়ত একদিন আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন আম বলতে থাকবে শুধু ম্যাঙ্গো জিলেটো আর আলফানসোর কাঠের প্যাকিং বাক্স। সেগুলোর অর্ডার হবে অনলাইন; হাই ডিসকাউন্ট অফারে। সেটাই হবে আম কুড়ানো বোশেখি ঝড়। মেদুর নস্টালজিয়া মাখানো। আমরা দাঁতে ছিঁড়ে কিংবা ছুরিতে কেটে আম খাব না। টিভি দেখতে দেখতে বহুজাতিক কোম্পানির বোতলে বন্দি আমরস পান করব। তৃপ্তির উদ্‌গার তুলে বলব, আহ রাসেলি!

ক্রেতা জুটছে না, বাজছে না সাইরেন। বন্ধ কারখানায় এখন সাপখোপের আড্ডা

বেশি বিপদে বড় বড় বাগানগুলোই, আজও চালু হল না টি বোর্ড বা ন্যূনতম মজুরি

'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **ষষ্ঠদশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

'কোরাস গলি গলি ফিরে/ সুরা বৈঠি বিকায়ে'

তুলসীদাসের এই শ্লোকটি দিয়েই আলাপচারিতা শুরু করলেন চা-গবেষক, টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রাক্তন আধিকারিক, ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সংগঠক রাম অবতার শর্মা। অর্থবিদ্যার এই কৃতী শিক্ষক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটেই চা-শিল্প, চা গাছ, চা শ্রমিক সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা তুলে ধরলেন 'এখন ডুয়ার্স'কে। বিস্তারিত সাক্ষাৎকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। কারণ এই লেখাটি যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন আর বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের নির্যাস তৈরি করার সময় নেই। জলপাইগুড়ি থেকে বীরপাড়ার বাসে চেপে এথেলবাড়ি পার হয়ে রহিমপুর মোড়। সেখানেই ঘোষ পেট্রোল পাম্প লাগোয়া টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার কার্যালয়ে স্বাগত জানালেন অমায়িক, সদালাপী, সৌম্যদর্শন রাম অবতার শর্মা। উদ্দেশ্য দূরভাষেই জানিয়েছিলাম। তাই প্রাথমিক কুশলাদি বিনিময়ের পর আমরা শুরু করলাম আমাদের আলাপচারিতা। রাম অবতার শর্মার মতে, শিল্প মানে চা শ্রমিক এবং চা গাছ। উভয়কে ছাড়া কোনও কিছুই ভাবা যায় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ধরন বদলে গিয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে বৃহত্তর চা-বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ রুজিরোজগারের ক্ষেত্র ছিল বাগিচাগুলো। পাশাপাশিভাবে প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টও হয়েছিল ১৯৫১ সালে, যার বলে শুধুমাত্র লাভের কড়ি নিয়ে যাওয়া নয়, লভ্যাংশের একটা অংশ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসায় খরচ করতে বাধ্য থাকত মালিকপক্ষ। কিন্তু সময়, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগিচার অর্থনীতিও পরিবর্তনশীল।

শুরুতেই তুলসীদাসের শ্লোকটি আউড়ে চা-বাগিচার বর্তমান অবস্থানটি এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন শর্মাজি। তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাইতেই সুরসিক এই চা-গবেষক বললেন, শ্লোকটির অর্থ এই যে— গোয়ালা বাড়িতে বাড়িতে দুধ চাই, দুধ চাই বলে দুধ

বিক্রি করছে, কিন্তু কেউ দুধ কিনছে না। অথচ সুরাওয়ালা এক জায়গায় বসে আছে, তার কাছে সবাই সুরা কিনতে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বৃহদায়তন বাগিচাগুলোর কাছে বিরাট বড় প্রশ্ন গুণগতমান ধরে রাখা, যাতে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ববাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। কারণ চা-শিল্প আফ্রিকা, কেনিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, ফলে গুণগতমান বজায় রাখা কাম্য। পাশাপাশিভাবে রাম অবতার শর্মার মতে, চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় বাগিচাগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা-চাষি এবং তাদের দ্বারা উৎপাদিত চা ভারতের বৃহত্তর বাজার দখল করে রেখেছে। ক্ষুদ্র চা-চাষিরা তাদের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে বাজারের প্রায় ৪০ শতাংশ জায়গা দখল করে ফেলেছে। ফলে বড় ফ্যাক্টরিগুলোকে উপর থেকে দেখলে যত সমৃদ্ধ মনে হয়, ভিতরটা ততটাই ঠুনকো। গুণগতমানসম্পন্ন চা-বাগিচাগুলোর চা এখন গোয়ালার দুধই। বিক্রির প্রয়াস থাকলেও ক্রেতার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও ক্রেতা জুটছে না।

মিস্টার শর্মার মতে, চা-শিল্প নিয়ে সমীক্ষা করতে গেলে অর্থনৈতিক ব্যাপারটা আগে বুঝে নিয়ে এগনো প্রয়োজন। বাজারে চাহিদা আছে কি নেই, চাহিদা থাকলে চাহিদা অনুযায়ী জোগান আছে কী নেই, চা-শিল্প বাজারের চাহিদা ও জোগানের তত্ত্ব অনুযায়ী সংকটে আছে কি নেই, লাভজনক অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বাগান আছে কি নেই— এইভাবে এগনো প্রয়োজন। কারণ উৎপাদনের সামগ্রিক খরচা মিটিয়ে তবেই তো মালিক-শ্রমিককে মজুরি বা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, চা উৎপাদন হয় প্রায় ১২৫০ মিলিয়ন কেজি। এর মধ্যে রপ্তানিযোগ্য চা ২৫০ মিলিয়ন কেজি। বাকি হাজার মিলিয়ন কেজি চা ভারতীয়রা ক্রয় করে জাতীয় মার্কেটে। তাই বলা যায়, চায়ের চাহিদা বাড়ছে, চায়ের বাজারও বাড়ছে। কিন্তু তা বটলিফ কারখানায় প্রসেস করা ভারতীয় বাজারের জন্য গ্রহণযোগ্য সিটিসি চা, যার বাজারদর খুব বেশি হলে ১০০ টাকা বা দু'-দশ টাকা বেশি বা কম। তাহলে মকাইবারির মতো বাগান, যাদের চা বিদেশের বাজারে কুড়ি হাজার টাকা প্রতি কেজি রেট ওঠে, তাদের শ্রমিকরা ভাল মজুরি পাবে না কেন? পাশাপাশি ডানকান'স গ্রুপের বাগরাকোট, গ্যান্দ্রাপাড়া, লংকাপাড়া, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া চা-বাগানগুলো দিনের পর দিন বন্ধ থাকবে কেন? কারণ গুণগতমানের প্রশ্নে এই বাগানগুলোর উৎপাদিত চা দাম পাচ্ছে না, রপ্তানি বাজারে ভাল ক্রেতা পাচ্ছে না, তার মধ্যে শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরির দাবি এবং প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্টের রকমারি ঝক্কি মেটাতে গিয়ে বাগানগুলোর ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হবার জোগাড়। একদিকে ডুয়ার্সে নতুন ৩২টা বটলিফ ফ্যাক্টরির আবেদনপত্র জমা পড়ে আছে ভারতীয় চা পর্ষদে, অন্য দিকে একটার পর একটা প্রতিষ্ঠিত চা-বাগিচা ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতে হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক একদিন বাগান ছেড়ে বিপন্ন জীবিকার সন্ধানে ডুয়ার্স ছাড়ছে।

উদ্‌বেগে মুখ্যমন্ত্রী

মিটিং-এর পর মিটিং হচ্ছে, টি ডিরেক্টরেট বা টি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করে আন্তরিকভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-বাগিচা শ্রমিকদের হাহাকার দূর করতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ডুয়ার্সের চা-বাগিচার জনপ্রিয় নেতা মোহন শর্মাকে বাগিচা শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষস্তরে রেখে দলীয় ট্রেড ইউনিয়নের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাটানোর লক্ষ্যে সব ক'টি বাগানে অভিন্ন দলীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন, জেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মোহন শর্মাকে শীর্ষনেতৃত্বে বসিয়েছেন জেলা পরিষদের। কিন্তু অধিকাংশ বাগিচা মালিক, চা-বাগিচার পরিচালকমণ্ডলীর একাংশ, টি বোর্ডের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ, কোনও কোনও বাগানের মেরুদণ্ডহীন আপসকামী শ্রমিক নেতৃত্বের অসহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছাপূরণের পথে তীব্র প্রতিকূলতা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমনকি উত্তরবঙ্গে যাঁর উপরে ভরসা করে তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেই সৌরভ চক্রবর্তীকেও আলিপুরদুয়ার সফরে তীব্র সমালোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কাউকে রেয়াত করতে ছাড়েন না।

কেন এই অনাস্থা?

দৃষ্টিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যাক। বিগত কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনের পর জয়ের ফারাক বাড়লেও তৃণমূল নেতৃত্বের মুখের হাসি কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। বাজারে হাওয়া ছিল, পদ্মে অস্বাভাবিক ঢল নামবে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষাতেও সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ওয়াকওভার নিশ্চিত জেনেও কোনও ঢিলেমি ছিল না প্রচার থেকে শুরু করে ভোটদান সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত। প্রয়োজন না থাকলেও জয় নিশ্চিত করার যাবতীয় 'কৃৎকৌশল' বুথে বুথে গ্রহণ করা হয়েছিল। অনিবার্য জয়ও এসেছে। কিন্তু? ছ'মাস আগে যে পদ্মের প্রাপ্ত ভোট ছিল এক লক্ষ আশি হাজার, এক লাফে তিন লক্ষ আশি হাজারে পৌঁছে গেল কোন জাদুমন্তরে? বামেদের কমে যাওয়া চার লক্ষ তিরিশ হাজার ভোটের দু'লক্ষ গেল বিজেপি-র বাক্সে। শাসক বিরোধী নেগেটিভ ভোট যে পদ্মে ঢলছে— এটাতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশনিসংকেত হিসাবে দেখছেন। চার লক্ষ বিরোধী ভোটের অর্ধেক বিজেপি-র বাক্সে ঢোকা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই শীর্ষনেত্রীর উদ্‌বেগ বাড়ছিল বলেই জেলা সফরটা শুরু হয় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার দিয়েই। একই দিনে অমিত শাহের আগমন, সারদা-নারদা মামলার চাপ, চা-বাগিচার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোলা অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত চাপে রেখেছে মমতাকে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো

কোলের শিশুটার একটু দুধও জোটে না

> টি ডাইরেক্টরেট গঠনের পর থেকেই আইনি জটিলতার সূত্রপাত। টি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের নামে নতুন নামকরণের পর টি ডাইরেক্টরেটের নতুন চেয়ারম্যান হন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি। দেড় বছর কাটতে চললেও এখনও পর্যন্ত টি অ্যাডভাইসরি বোর্ড সাইনবোর্ড সর্বস্ব।

বিধায়কদের একটার পর একটা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছেন, এবং প্রশাসনিক সভাতেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, কালচিনির বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারীকে যেমন সমঝে দিয়েছেন নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে, অন্য দিকে মোহন শর্মার উপরেও ভরসা রেখেছেন জেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে।

লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল লক্ষ্য উন্নয়ন। কারণ তিনি জানেন মানুষের চাহিদা সামান্য। বিশেষত গরিব মানুষ, কৃষিজীবী, নিম্নমধ্যবিত্ত, চা শ্রমিক, গ্রামীণ গরিব মহিলা, গ্রামীণ লোকশিল্পী, ভূমিহীন কৃষক, ঠিকা শ্রমিক। ফলে সরকারি পরিচালনায় জনপ্রিয় যে সমস্ত প্রকল্প, সেগুলোর আবর্তন গরিব মানুষকে কেন্দ্র করেই। উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলার দাবি, তার বাস্তবায়ন এবং তার প্রশাসনিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন তাঁর অন্যতম মাস্টারস্ট্রোক, যার সুফল কুড়িয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক। কিন্তু প্রশাসনিক চাপের কারণে নেত্রীর ভরসার জায়গা থেকে এই মুহূর্তে সৌরভ চক্রবর্তী অনেকটা দূরে বলেই আম জনতা মনে করছে। এর প্রেক্ষাপটে মূল কারণ অবশ্যই চা-বলয়। কারণ প্রথম অবস্থায় টি ডিরেক্টরেট গঠন এবং উত্তরবঙ্গের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তার চেয়ারম্যান হিসাবে সৌরভের নাম, পরবর্তীকালে আইনগত কারণে টি ডিরেক্টরেটের বদলে টি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে তাঁর মনোনয়নে শীর্ষনেতৃত্ব আশা করেছিলেন, টি অ্যাডভাইসরি বোর্ড বাগিচা শ্রমিকদের ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট দিশা রাজ্য সরকারকে দিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তব কী বলে? ডি ডিরেক্টরেট গঠনের পর থেকেই আইনি জটিলতার সূত্রপাত। টি অ্যাডভাইসরি বোর্ডের নামে নতুন নামকরণের পর টি ডিরেক্টরেটের নতুন চেয়ারম্যান হন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি। দেড় বছর কাটতে চললেও এখনও পর্যন্ত টি অ্যাডভাইসরি বোর্ড সাইনবোর্ডসর্বস্ব। সাইনবোর্ডে যে এখনও টি ডিরেক্টরেট লেখা ঝলমল করছে মূল প্রশাসনিক অফিস বিবেকানন্দ ভবনে, সেটা পালটানোরও সময় পাননি সৌরভ চক্রবর্তী বা অন্য কেউই।

সৌরভ চক্রবর্তী ছাড়াও মোহন শর্মা, পাহাড়ের তৃণমূল নেত্রী শান্তা ছেত্রীরাও বোর্ডের সদস্য। বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, যে বোর্ডের চেয়ারম্যানও সৌরভ চক্রবর্তী। তাই ঘটা করে বোর্ড তৈরির উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে শ্রমিক, মালিকসহ অনেকেই। বোর্ডের কর্মসূচি কী হবে, বোর্ড কীভাবে পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাবে, কোন কোন সেক্টরে বোর্ড কাজ করবে, অর্থ কীভাবে বরাদ্দ করা হবে এবং তা কোন কোন খাতে, কোনও কিছুই পরিকল্পনা করা হয়নি। পরিকল্পনাহীনভাবে চলছে টি অ্যাডভাইসরি বোর্ড এবং মালিকপক্ষের অঙ্গুলিহেলনে পুতুলনাচের মতো নাচানো হচ্ছে শ্রমিকদের। ডিরেক্টরেট বদলে অ্যাডভাইসরি বোর্ড হলেও কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। হিলকার্ট রোডে ঝাঁ-চকচকে দপ্তর কার্যত সাইনবোর্ডসর্বস্ব হওয়ার ফলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে চা-বলয়ে, ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে চেয়ারম্যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও। ধুঁকতে থাকা চা শ্রমিকরা টি ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা সমাধানে বা রুগ্‌ণ বাগান অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বা বন্ধ বাগান খোলা নিয়ে আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু বিধি বাম। ঘোষণামতো কাজ এগয়নি এক ফোঁটাও। বন্ধ এবং পঙ্গু চা-বাগিচাক্ষেত্রে পানীয় জল, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, শ্রমিকদের বাসস্থান তৈরির মতো সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজগুলো একেবারেই অবহেলিত। বাস্তবের মাটিতে চলা মুখ্যমন্ত্রীর এটাই হয়ত রাগের কারণ।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্‌বেগের অন্য কারণও রয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটের সভায় চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। ব্যর্থ হয়েছে মজুরি বাবদ প্রদেয় রেশন নিয়ে বৈঠকও। শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী শ্রমিক

বিকল্প পেশার খোঁজে বাগিচা শ্রমিকেরা

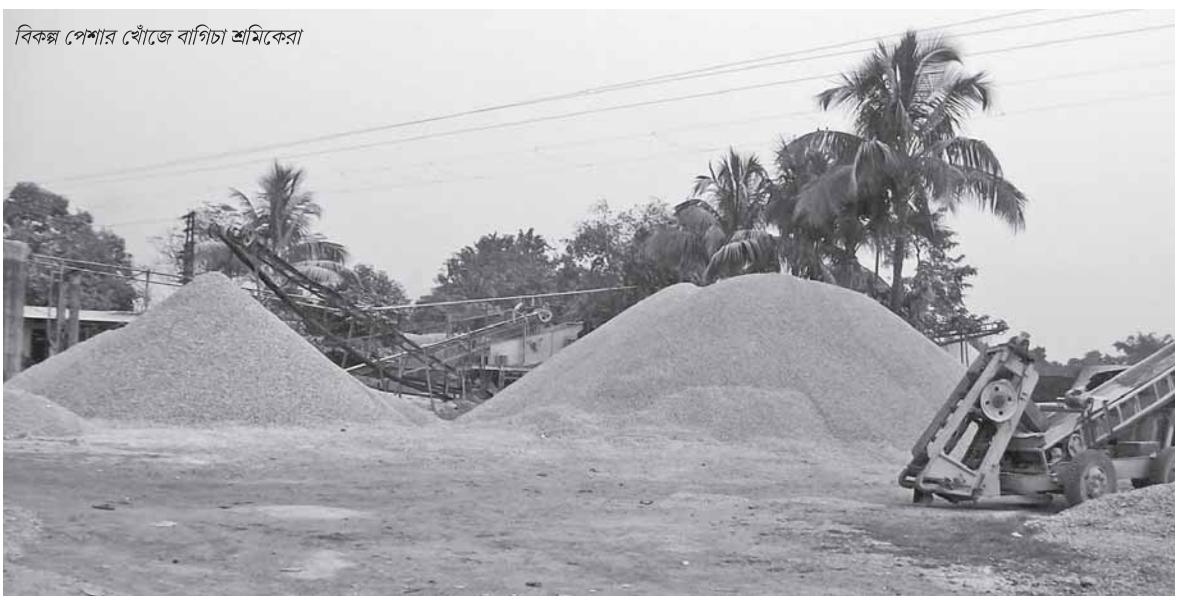

সংগঠনের সদস্যরা সকলে মিলে আলোচনা চালিয়েও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত রাজ্য সরকার গঠিত ২৯ সদস্যের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে চা শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতামতের সাপেক্ষে মালিকপক্ষের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ইতিমধ্যেই চারটি বৈঠক হয়েছে। পঞ্চম বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৭ মে। বৈঠকে উপস্থিত রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে মালিকদের এ ব্যাপারে মতামত জমা দিতে বলেছেন। পাশাপাশি চা-বাগিচাক্ষেত্রে জাতীয় খাদ্যসুরক্ষা আইন বা এনএসএফএ-র র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে বছরখানেকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা মজুরি বাবদ প্রদেয় র‍্যাশন নিয়েও কোনও সমাধানসূত্র বেরয়নি। খাদ্য দপ্তর যে পরিমাণ ঠিক করেছিল, শ্রমিকদের তাতে পূর্ণ সম্মতিও ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ মজুরি র‍্যাশনের স্পষ্ট কোনও মতামত জানায়নি। ফলে দু'টি বৈঠকই ব্যর্থ হওয়াতে ব্যাপক উদ্‌বেগ এবং ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রমিকমহলে। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের চা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তেজকুমার টোপ্পোর মতে, ন্যূনতম মজুরি নিয়ে রাজ্য সরকার তাদের খসড়া মতামত না জানালে আলোচনা হবে কোথা থেকে? ২৩টি চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক মণিকুমার দার্নাল বলেন, মালিক, রাজ্য সরকার, টি বোর্ড— কেউই শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উত্তরের বাগিচাক্ষেত্রের সংকটের এই ঝোড়ো হাওয়া কালবৈশাখী রূপ ধারণ করবে কি না তা নিয়ে স্পষ্টতই চিন্তিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্তত আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক মিটিং-এ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এই দুশ্চিন্তা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে।

অচিরেই কালবোশেখি ঝড়?

উত্তরবঙ্গের সমস্ত বাগানে 'এয়লান' দিবস পালন করে হুঁশিয়ারি প্রদান, বাগানে বাগানে প্রতিবাদী বিক্ষোভ সভা, শ্রমিকদের মহামিছিলের মাধ্যমে রাজ্যকে চাপে রাখতে টানা কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে দুর্বার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে জয়েন্ট ফোরাম। সুরজ সুব্বা, মণিকুমার দার্নাল, অভিজিৎ মজুমদার, জন ফিলিপ খালকো প্রমুখ সংগঠনের নেতারা মে মাস পর্যন্ত টানা

চা বাগিচাগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ বিশিষ্ট চা শিল্পপতি, বাগান মালিক এবং বিশিষ্ট মানুষজন।

আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে চলেছেন। শ্রমিকদের অভিব্যক্তি হল, তাঁরা তো শেষ হয়েই গিয়েছেন, তাই তাঁরা শেষ দেখা দেখতে চান। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখনও বাগান থেকে খবর আসেনি 'কাম-দাম-ধাম' কর্মসূচি সফল হল কি না। এই কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল, প্রতিটি বাগানের শ্রমিকরা মশাল মিছিল করে আশপাশের বাগানগুলোতে গিয়ে সেখানকার শ্রমিকদের হাতে মশালগুলো তুলে দেবেন এবং এই ধরনের কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে চলবে। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে রাজ্য সরকার নিযুক্ত পরামর্শদাতা কমিটির কোনও বৈঠকেই কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। চা শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি চুক্তির মেয়াদ যেহেতু গত ৩১ মার্চ ফুরিয়ে গিয়েছে তাই ফোরামের আশু লক্ষ্য, নির্দিষ্ট কোনও মজুরি চুক্তি না করে ন্যূনতম মজুরি চুক্তি, গুয়াহাটিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী নিজেই আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির আওতায় নিয়ে আসতে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তাই শিল্প নিয়ে সকলকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। চায়ের কোনও বিকল্প নেই। এত কম পয়সায় এরকম একটা পানীয় আর নেই। কিন্তু এটাও বাস্তব, বৃহত্তর বাগান ভাঙছে। কারণ এস্টাবলিশমেন্ট খরচ, শ্রমিকদের মজুরির বাস্তবোচিত দাবিজনিত খরচ বাড়ছে। এই বর্ধিত খরচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাগিচা মালিক মেটাতে চাইছে না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেটাতে পারছে না। সরকারই বা ভরতুকি দেবে কতদিন? দিলে তার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে? এইসব প্রশ্ন প্রতিদিনই জলজ্যান্ত সমস্যায় রূপান্তরিত হচ্ছে। চায়ের বাজার আছে, অন্য দেশ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভাল মুনাফা করছে, ভারতীয় চায়ের এখনও বিশ্ব বাজারে সুনাম আছে অথচ প্রশ্ন একটাই যে, বন্ধ চা-বাগান লিজে নিয়ে চালাবার ক্রেতা নেই কেন? টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনেরও তো পাঁচটি বাগান অধিগ্রহণ করে চালাবার ইতিহাস আছে। সেগুলো তো ব্যক্তি-মালিকানায় বিক্রিও হয়েছিল। ডানকান'স গ্রুপের বাগানগুলোতে তো কোনও সমস্যা ছিল না, তাহলে এখন ডানকান'স গ্রুপের বাগানের পর বাগান বন্ধ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই কেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সন্তানকে সুপাত্রে অর্থাৎ যোগ্যতম হাতে তুলে দিতে? অথচ ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ মোদ্দা কথা, বাগান চালানোর সদিচ্ছাসম্পন্ন আর্থিকভাবে সক্ষম ও সচ্ছল ব্যক্তি-মালিকানাধীন ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না— এটাই সমস্যার।

তবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্ত্রীসভার একাধিক সহকর্মীকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনা করছেন নিজের সীমিত সাধ্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে। বন্ধ বাগিচা শ্রমিকদের ফাউলাই প্রকল্পের টাকা সময়ে পৌঁছানো, খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পের চাল, মোবাইল স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ একাধিক জনকল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি গত ৬ মে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'স্টেট প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিল'-এর সভায় প্রায় ২০০ জন বাগিচা মালিক এবং বাগিচা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন বাগিচাগুলোর হালহকিকত নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করতে। শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক প্রতিনিধিদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি জানান। প্রধান অতিথি শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে উৎপাদনের মাত্রাতিরিক্ত বর্ধিত মূল্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শ্রমিক সমস্যা, মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে মত বিনিময় করলেন আলোচকরা। ২০১৭ সাল চা শিল্পে সমৃদ্ধি ও সুখের বছর বলে চিহ্নিত হবে, নাকি বাগানে বাগানে হতাশা, হাহাকার আর চোখের জলই সঙ্গী হবে শ্রমিকদের তা সময়ই বলবে।

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

কমলে তো কাঁটা থাকবেই। যুবসম্মেলনের সাফল্যের পর দিল্লির রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে শুরু করায় রাজ্যে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। পরিস্থিতি সূক্ষ্ম হতে হতে এমন জায়গায় পৌঁছাল যে হেলিকপ্টার থেকে ক্রান্তির হেলিপ্যাড খুঁজেই পেলেন না পাইলট! প্রভাব পড়ল প্রথমবার নেতা হওয়ার যাত্রায়। ধারাবাহিক স্মৃতিকথার এই পর্বটি অতঃপর এমন সব ঘটনা ও সংবাদ তুলে ধরবে, যা হার মানাবে যে কোনও কল্পকাহিনিকে। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। কণ্টকবিদ্ধ লেখক তাই জীবনপ্রবাহে ভেসে প্রথমবার হাজির হলেন 'বিলেত'-এ। সঙ্গে ব্যাগ ভরতি বিশ দফা কর্মসূচির কাগজ আর ইন্দিরাজির ছবি।

।।৩২।।

দিল্লিতে যতই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছিল, রাজ্যে ততই বিরোধিতা বাড়ছিল। রাজীবজি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হয়ে গিয়েছেন, আর আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে দলে স্বীকৃতি পাচ্ছি, গুরুত্ব বাড়ছে— এটা রাজ্য নেতৃত্বের চোখে বোধহয় অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল।

তখন রাজ্যে নেতাদের যে স্তর ছিল, তাতে এক নম্বরে ছিলেন বরকতদা, দুইয়ে প্রণবদা, তিনে সাত্তার সাহেব। তারপর আর কোনও অর্ডার নেই, যে যখন পাচ্ছে, নিজেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই রেষারেষিও ছিল প্রবল। রাজ্যের গোষ্ঠী লড়াইয়ের প্রভাব জেলাতেও পড়ছিল, কারণ ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধি রাজনীতিকে আরও প্রকট করে তুলেছেন।

আমি প্রণবদাকে একটু বেশি সম্মান করতাম। কারণ, তাঁর কাছে গেলে অনেক ভাববার মতো বিষয় নিয়ে শোনবার অবকাশ হত। রাজনৈতিক খিদে মিটত। বরকতদা আমাকে কোনওকালেই পছন্দ করতেন না। এই রাজ্যে প্রথম পঁচিশজন হাতে গোনা লোক নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস শুরু হয়েছিল। বিভাজনের পর বরকতদাকে সভাপতি করে প্রথম যে কার্যকরী সমিতিটা ঘোষিত হল, চব্বিশজন স্থান পেয়েছে। কেবল আমি বাদ। তাঁর এই মানসিকতার ফলে আরও বেশি করে নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রণবদার দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনটা সফলভাবে সঞ্চালন করতে পারার ফলে আমি যুব কংগ্রেসের বিদেশ দপ্তর সামলানোর দায়িত্ব পেয়েছিলাম। অর্থাৎ বিদেশ থেকে যে আমন্ত্রণগুলো আসবে, তার চূড়ান্তকরণ আমার হাতে ছিল। ফলে, ডেলিগেশনে বুলু (সুখেন্দুশেখর রায়)-কে রুমানিয়া পাঠিয়ে দিলাম। বরকতদা রেগে অগ্নিশর্মা। ওঁর সঙ্গে বুলুর সম্পর্ক তখন একদম তলানিতে। ওঁর চিৎকার-চেঁচামেচিতে সোমেনদা বলেছিলেন, আমি কিছুই জানি না। যা করার মিঠু করেছে।

আমার জন্য ওঁর দরজা একরকম বন্ধ হয়ে গেল। আমি জানতাম, একদিন প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান জানাতেই হবে। আমি তাই নিজে থেকেই বলতে শুরু করলাম, আমি প্রণবদার শিবিরের লোক। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন এল। গুলাম নবিকে রাজীবজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ভিতর কে কে বিধানসভায় লড়তে আগ্রহী? আনন্দ সিমলা থেকে আর আমি জলপাইগুড়ি থেকে। আমরা দু'জন সাধারণ সম্পাদক। তাই টিকিট নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না।

'৭১ সালে যখন নির্বাচনে অনশন করে অনুপম সেনকে দাঁড় করানো হয়েছিল, তখন উনি বলেছিলেন, তোর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি আছি। তুই পঁচিশ বছর হলেই এই আসন তোর। তাই আমি জলপাইগুড়ি আসন চেয়ে বসলাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বদলায়। মানুদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুপমদা '৭৭ সালে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু '৮২ সালে জানা গেল, এবার উনি দাবিদার। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমায় মাত্র দু'টি জেনারেল সিট। জলপাইগুড়ি আর নতুন সিট ক্রান্তি। স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ক্রান্তি যেতে হল। আপালচাঁদ ফরেস্ট দিয়ে এবং এনএইচ-৩১ দিয়ে আর ময়নাগুড়ি দিয়ে এই কেন্দ্রে ঢুকতে হত। কোনও একটা বড় জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাকিটা সাইকেলে ঘুরতে হত। প্রতিপক্ষ সিটিং এমএলএ বন মন্ত্রী পরিমল মিত্র। সে সময় যাঁরা নির্বাচনে লড়েছেন, তাঁরা জানেন, সিপিএম-এর সন্ত্রাস কোন

পর্যায়ে ছিল। রোজ মারামারি। আর পুলিশের লজ্জাজনক শাসকদলের তাঁবেদারি। তা সত্ত্বেও একটা জয়ের পরিবেশ মোটামুটিভাবে তৈরি করা গিয়েছিল, কারণ আমার পক্ষে কর্মী নেমেছিল প্রচুর। এমনকি বাইরের রাজ্য থেকেও অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে কাজ করছিল। আমাকে পরবর্তীতে হাসিম আবদুল হালিম সাহেব বলেছিলেন, তোমার কর্মীদের আনাগোনা দেখে শঙ্কিত হয়ে পরিমল আমায় বলেছিল, আপনি আইন মন্ত্রী, এসপি-কে বলুন মিঠুর ‘গুন্ডা’গুলোকে জেলে পুরতে। না হলে ফলাফল কী হবে বলা যাচ্ছে না। ’৮২ সালে বামেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করত ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত রিগিং তখনও রপ্ত করে উঠতে পারেনি। তাই স্থানীয় পত্রপত্রিকায় লিখেছিল, ক্রান্তিতে বাঘে-সিংহে লড়াই হচ্ছে।

আমাদের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-তে একজন অবাঙালি নেতা ছিলেন, দয়ারাম বেরি। তিনি বলতেন, ‘কংগ্রেস জিনকা দোস্ত হ্যায়, উনকো বাহর কে দুশমন কি জরুরত নহি।’ ক্রান্তির ভোটে কথাটার সত্যতা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। আমার নির্বাচনে প্রচারে যে বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলা হত তা হল আমার রাজীবজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যুব কংগ্রেসের জাতীয় স্তরে ছিলাম। তাই মানুষ বিশ্বাসও করেছিল এবং সেই বিশ্বাসকেই ভোটে পরিণত করতে নির্বাচনের তিন দিন আগে রাজীবজি আমার এলাকায় প্রচারে আসছেন বলে জানানো হল।

ক্রান্তির মতো প্রত্যন্ত এলাকায় রাজীবজি আসছেন— সে এক অসম্ভব উন্মাদনা। সকাল ১০টায় মিটিং, তাতে কী! ন’টার মধ্যে দেবীঝোরা স্কুলের মাঠ কানায় কানায় ভরতি। হেলিপ্যাডে ধোঁয়া সৃষ্টি করে জানান দেওয়া হচ্ছে কোথায় নামতে হবে। ১০টা থেকে বেলা ৩টে। তিরিশ হাজার মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এলাকার কোনও দোকানে কোনও খাবার নেই। কুয়োর জল পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনটের পর বোঝা গেল, তিনি আসছেন না। এবং ভোটের ফলও সে দিন ঠিক হয়ে গেল। বিকেলে হাটে বামেদের মিছিল বার হল, ‘ধোঁকাবাজ মিঠু রায়কে একটি ভোটও নয়।’ আমি সাত হাজার ভোটে হেরে গেলাম।

পরবর্তীতে আইপিএস অফিসার মিস্টার থাম্বি আমায় বলেছিলেন, ‘আমি তখন আপনাদের এসপি ছিলাম, কোল ইন্ডিয়ার হেলিকপ্টার ছিল। বরকত সাহেব কয়লা মন্ত্রী ছিলেন, তিনি পাইলটকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি ক্রান্তি ওভারফ্লাই করবে। বলবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছ না।’

রাজনীতিতে যোগ দেবার ১৭ বছর পর প্রথম নির্বাচনে দলের প্রতীকে লড়ে হার স্বীকার করতে হল। স্বাভাবিকভাবেই মনটা খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। ক’দিন পর দিল্লি গেলাম।

সকালবেলা ২এ মোতিলাল নেহরু মার্গে গিয়ে রাজীবজির সামনে দাঁড়াতেই উনি বললেন, ‘ডিপি, আই অ্যাম সরি। তোমার জায়গাটাই খুঁজে পাওয়া গেল না।’ আমি কথা বাড়ালাম না। বললাম, ‘ভাগ্যে জয় ছিল না, তাই এমন হল।’

ভেঙে পড়লে চলবে না। তাই পুরনো প্রস্তাবটি নিয়ে নতুন করে এগবার কথা ভাবতে শুরু করলাম। রাজীবজিকে সুযোগ পেয়ে একদিন মনে করালাম, আমার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়টি ওঁর মাথায় আছে কি না। উনি বললেন, ‘আমার মনে আছে। শিগগিরই শুরু করব।’ তবে মনে যে আছে তা কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম। যখন তিনি জুলাই মাসে আমাকে বললেন, ‘ডিপি, ইংল্যান্ডে ওভারসিজ কংগ্রেস বিশ দফা কর্মসূচির উপর একটা সেমিনার আয়োজন করেছে। আমি যেতে পারব না। তুমি অরুণ নেহরুর সঙ্গে চলে যাও।’

২২ জুলাই রাতের প্লেনে রওনা দিলাম। ইরাক গিয়েছিলাম চারজন মিলে, ডিরেক্ট ফ্লাইট। আর এবার যাচ্ছি একা। কারণ অরুণ নেহরু বললেন, উনি অন্য রুট দিয়ে যাবেন। আমি ইন্দিরাজির ছবিযুক্ত বিশ দফা কর্মসূচির পুস্তিকা একটা সুটকেসে ভরতি করে এবং আরেকটা সুটকেসে জামাকাপড় নিয়ে রওনা দিলাম ভায়া প্যারিস। ভারতীয় দূতাবাসকে বলা ছিল, আমি যেন এয়ারপোর্টে কোনও না কোনও এমব্যাসির স্টাফের সহায়তা পাই। একজন ঠিকই ছিলেন। উনি আমাকে নিয়ে একটি হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বললেন, আজ প্যারিস দেখুন, কাল ডিপারচারের দু’ঘণ্টা আগে এসে আমি আপনাকে নিয়ে লন্ডনের প্লেনে তুলে দেব। দেখতে হলে পয়সা লাগে। প্যারিস দেখব তো প্যারিসের লোকাল কারেন্সি না থাকলে কোথায় যাব? হোটেলের লোকগুলো এত পাজি, আমি ইংরেজি বললে ফ্রেঞ্চে উত্তর দিচ্ছে। ফলে কোনও ডলার ভাঙানো গেল না। হেঁটে আইফেল টাওয়ার পর্যন্ত গেলাম। শুনেছিলাম, প্যারিসে এসে যে সাঁসে লিজেতে সান্ধ্য ভ্রমণ করেনি, কাউকে সে যেন না বলে যে, সে প্যারিসে গিয়েছিল।

আমি ঠিক করলাম, কাউকে বলব না তা-ও ভাল। কিন্তু যে কাজের জন্য রাজীবজি আমাকে যোগ্য মনে করে পাঠিয়েছেন, আমার সেটার প্রতিই নজর দেওয়া দরকার। পরের দিন লন্ডনের ফ্লাইট। দু’ঘণ্টার জার্নি। হিথরোতে পৌঁছে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ভিসা-পাসপোর্ট সবই দেখালাম। সে ব্যাটা কোথা থেকে এক নতুন গল্প ফাঁদল, ‘তোমার পারমিট কই?’ আমি বললাম, কোনও পারমিট লাগে বলে তো কেউ আমায় বলেনি। সে বান্দা বুঝতে রাজি নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, সিকিউরিটি এরিয়ার বাইরে মগনভাই বারোট আমাকে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ লোকটা বলে উঠল,

20 POINT PROGRAMME

1. Steps to bring down prices of essential commodities. Stream-lined production, procurement and distribution of essential commodities.
2. Implementation of agricultural ceilings and speedier distribution of surplus land and compilation of land records.
3. Stepping up of provision of house sites for the landless and weaker sections.
4. Bonded labour, wherever it exists, will be declared illegal.
5. Plan for liquidation of rural indebtness. Legislation for moratorium on recovery of debt from landless labourer's, small farmers and artisans.
6. Review of laws on minimum agricultural wages.
7. Five million more hectares to be brought under irrigation. National programme for use of underground water.
8. An accelerated power programme. Super thermal stations under Central control.
9. New development plan for handloom section.
10. Improvement in quality and supply of people's cloth.
11. Socialization of urban, and urbanizable land. Ceiling on ownership and possession of vacant land.
12. Special squads for valuation of conspicious constructions and prevention of tax evasion. Summary trials and deterrent punishment of economic offenders.
13. Special legislation for confiscation of smuggler's properties.
14. Liberalization of investment procedures. Action against misuse of import licences.
15. New schemes for workers' association with industry.
16. National permit scheme for road transport.
17. Income-tax relief to middle class. Exemption limit raised from Rs 6,000 to 8,000.
18. Essential commodities at controlled prices to students in hostels.
19. Books and stationery at controlled prices.
20. New apprenticeship scheme to enlarge employment and training, specially for weaker sections.

বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে

২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর

(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

ওল্ড সিল্ক রুট	: ৪৫০০ টাকা
পেলিং	: ৫৫০০ টাকা
লোলেগাঁও রিশপ	: ৪৫০০ টাকা
গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু	: ৫৫০০ টাকা
ডুয়ার্স	: ৪১০০ টাকা
দার্জিলিং	: ৪৯০০ টাকা

(খরচ জনপ্রতি)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

তুমি কেন এসেছ? আমি সেমিনারের কথা বলে ওঠাতে বলল, 'কী ডকুমেন্ট আছে যে সেমিনারে তুমি যোগ দিতে এসেছ?' সত্যিই আমার কাছে কোনও আমন্ত্রণপত্র নেই। আমি মরিয়া হয়ে দ্বিতীয় সুটকেসটা খুলে বিশ দফার বইগুলো দেখালাম। ইন্দিরাজির ছবি দেখে সে বলে উঠল, 'তুমি বলবে তো যে তুমি ইন্দিরা গান্ধির দলের লোক। তাহলে তো কত আগেই তোমাকে ছেড়ে দিতাম!'

যা-ই হোক, এয়ারপোর্টের ফাঁড়া কেটে যখন বার হলাম, মগনভাই বারোট বলল, আসলে তোমাকে পাকিস্তানি ভেবে এত জেরা করছিল। আমি বললাম, তা-ও আমি দাড়ি কামাব না।

অরুণ নেহরু বিশ দফার উপর তিরিশ পাতার ভাষণ তৈরি করে নিয়ে এসেছেন ইংরেজিতে। যেই পড়তে শুরু করলেন, শ্রোতারা হইহই করে উঠল। ওরা সবাই ভারতীয়। ওরা ইন্ডিয়া থেকে আসা বক্তার কাছ থেকে ইংরেজিতে শুনবে কেন?

সেমিনারটা ছিল বার্মিংহামে। আমরা ছিলাম লন্ডনে। অরুণ নেহরু একটা হোটেলে ছিলেন। আমি মগনভাইয়ের আত্মীয় নিশীথভাই দেশাইয়ের বাড়িতে ছিলাম। ২৪ তারিখ অরুণ নেহরু বললেন, শোনো, ইন্দিরাজির সঙ্গে রাজীব ইউএস যাওয়ার পথে হিথরোতে নামবে। আমি দেখা করতে যাব। তুমি হোটেলে অপেক্ষা করো।

২৩ তারিখ লন্ডনে নামার পরেই অরুণ নেহরু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি টাকাপয়সা কী এনেছ? আমি বললাম, যা পারমিসেবল তা-ই। ৫০০ ডলার। বলল, তোমায় ২১ দিন থাকতে হবে। তুমি তো না খেয়ে মরবে। আমি বললাম, এর বেশি আনতাম কী করে, যা আইনে নেই! আমি এতেই চালিয়ে নিতে পারব।

২৪ তারিখ রাজীবজি আর ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে অরুণ নেহরু বললেন, আমি তোমার সমস্যা রাজীবজিকে বলেছিলাম, ও তোমার জন্য ৫০০ ডলার আমার কাছে দিয়ে গিয়েছে। তবে তুমি যা কৃপণ। তোমার এখন তো লাগবে না। আমি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে তোমায় দিয়ে দেব। আমি বললাম, তাতে আমার ভালই হবে। আমি দিল্লি গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পাব।

নির্ধারিত দিনে বাকিংহাম যাওয়া হল। মূল বক্তা অরুণ নেহরু। আমি সহকারী। অরুণ নেহরু বিশ দফার উপর তিরিশ পাতার ভাষণ তৈরি করে নিয়ে এসেছেন ইংরেজিতে। যেই পড়তে শুরু করলেন, শ্রোতারা হইহই করে উঠল। ওরা সবাই ভারতীয়। ওরা ইন্ডিয়া থেকে আসা বক্তার কাছ থেকে ইংরেজিতে শুনবে কেন? হিন্দি হিন্দি— চিৎকার শুরু হল। অরুণ নেহরু বিষয়টা নিয়ে ভাবেইনি। তাই হিন্দিতে বিশ দফার উপর কিছুই বলার ছিল না। উনি ধপ করে বসে পড়লেন।

আমি ততদিনে হিন্দিটা রপ্ত করে নিয়েছি। আর বিশ দফার উপর প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার ফলে বিশ দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণা ছিল। আমি দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে উঠলাম। মিনিট চল্লিশেক বললাম। সবাই খুব ভালভাবে নিল। এবং তারপর সেমিনার শেষে চা-পানের সময় বিভিন্ন জায়গার ভারতীয়রা তাদের এলাকায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। রাতে সতনাম সিং সহোতা বলে একজনের বাড়িতে ছিলাম। টুরিজমের কাজ করে। ওর সঙ্গে পরে আমার বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘদিন। সাকুল্যে ২১ দিন ছিলাম। ওয়ালসল, কভেন্ট্রি, লেস্টার ও বার্মিংহাম— ইংল্যান্ডের দিনগুলো ভালই কেটেছিল। কভেন্ট্রিতে একটি বাঙালি পরিবার (অনুপম ব্যানার্জির) একদিন বাড়িতে ব্রেকফাস্টে ডেকে লুচি-পায়েস খাওয়াল।

২১ দিন থাকার কারণ ছিল ওভারসিজ ইন্ডিয়ানদের কোনও সমস্যা থাকলে তা অনুধাবন করে সমাধান কী হতে পারে, সে ব্যাপারে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া। আমি তিন সপ্তাহ থেকে বুঝেছিলাম, যে প্রজন্ম ইংল্যান্ডে জন্মেছে, সে ভারত নিয়ে কোনও ধারণা তৈরি করতে পারেনি, কারণ মা-বাবা একসময়ে বিলেতে এসে রোজগার করে আর্থিক অবস্থাটা বদলেছে, কিন্তু শিক্ষার অভাব থাকার ফলে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দেশ সম্পর্কে কোনও সঠিক চিত্র দিতে পারেনি। অন্য দিকে হোয়াইট সোসাইটিতে ভারত বিরোধী একটা প্রচার সবসময়েই থেকেছে। ইন্ডিয়া ইজ দ্য ল্যান্ড অব স্নেক চার্মার, ব্ল্যাক ম্যাজিক— এটাই মূলস্রোতে নানাভাবে চর্চিত হওয়ার ফলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েরা একটা হীনম্মন্যতায় ভুগতে ভুগতে একদিকে মা-বাবার উপর, অন্য দিকে ভারতের উপর একটা অভিযোগজনিত অভিমান নিয়ে বড় হচ্ছিল। হয়ত আজ এটা ওখানকার অবস্থা নয়, কিন্তু আমি এটাই দেখতে পেয়েছিলাম। ফিরে এসে একটা রিপোর্টে এই বিষয়গুলো লিখে জমাও দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ পড়েছিল বলে মনে হয় না।

(ক্রমশ)

অনুদান নেই, সদস্য চাঁদা আজও মাসে দশ টাকা রাজ ঐতিহ্য নিয়েও মলিন কোচবিহার ক্লাব

কোচবিহার শহরের পথে পথে ছড়িয়ে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন নানা প্রতিষ্ঠান। শহরের মদনমোহন বাড়ির দক্ষিণে, বৈরাগী দিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে ১২০ বছরের পুরনো কোচবিহার ক্লাব। আপাতদৃষ্টিতে বড্ড সাদামাটা টিনের চাল দেওয়া নিরীহ ক্লাবটিকে দেখে এর বয়স বা কৌলীন্য বোঝা সাধারণের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ এর পিছনেই লুকিয়ে রয়েছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস, এক গৌরবময় অতীত। বর্তমান থেকে একবার ঘুরে আসা যাক সেই অতীতের পাতায়।

১৮৮৪ সাল, রাজন্যশাসিত কোচবিহার রাজ্য। রাজ্যের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ রাজপুরুষগণ তাঁদের সন্ধ্যাকালীন অবসরযাপনের জন্য একটি ক্লাবের প্রয়োজন অনুভব করেন। ক্লাব তৈরির জন্য উপযুক্ত জায়গার আবেদন করে রাজকর্মচারীদের স্বাক্ষরসংবলিত একটি আবেদনপত্র তাঁরা মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে দেন। কিন্তু সেই আবেদনপত্রে কোনও কাজ হয় না। পরবর্তীতে ১৮৮৮ সালের ৩০ এপ্রিল রাজ্যের নায়েব আহিলকার বাবু, যদুনাথ ভট্টাচার্য এবং তৎকালীন পুলিশ সুপার কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে আবারও একটি আবেদনপত্র মহারাজার কাছে জমা দেওয়া হয়। সেই পত্রেও পূর্ববর্তী সকলের স্বাক্ষর করা ছিল। সেখানে তাঁরা আনন্দময়ী ধর্মশালার বিপরীতের অতিথিনিবাসটি বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য অথবা যেখানে বর্তমান কোচবিহার ক্লাব অবস্থিত, সেখানে এক একর জমির জন্য আবেদন করেন। এরও প্রায় এক বছর পর ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ রেভারেন্ড গডলে, সিভিল অ্যান্ড সেশন জজ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, পুলিশ সুপার কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ

মহারাজার সঙ্গে দেখা করে ক্লাবের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অনুরোধ মঞ্জুর হয়। স্টেট কাউন্সিলের আদেশক্রমে এক একর জমি ক্লাবের জন্য দান করা হয়। ক্লাবের বাড়ির নকশা ও খরচের হিসাবের দায়িত্বে ছিলেন বাবু কেদারনাথ মজুমদার। ক্লাব তৈরির জন্য আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। এই টাকা জোগাড় করা রাজকর্মচারীদের পক্ষে কঠিন ছিল। কোচবিহারের দেওয়ান আবাসের পুরনো অব্যবহৃত ইট, কাঠ, দরজা, জানালা, টিন ইত্যাদি দিয়ে খুব কম খরচে টিনের চাল দেওয়া দু'টি বড় ঘর ও তার লাগোয়া আরও দু'টি ছোট ঘর তৈরি করা হল। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ নিজে ৫০০ টাকা দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

অবশেষে ১৮৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল কোচবিহার রাজ্যে প্রথম এলিট ক্লাব হিসেবে জন্ম হল কোচবিহার ক্লাবের। ক্লাবের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং। রাজদরবার থেকে প্রতি মাসে ক্লাবকে ১০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হত। কোচবিহার ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় ১৯ জনের একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। জানলে অবাক হতে হয় যে, সেই নির্বাচিত কার্যকরী কমিটিতে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো ব্যক্তিত্ব। এই ক্লাবের সঙ্গে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের নাম জড়িয়ে থাকা একদিকে যেমন গর্বের, তেমনই বিস্ময়ের। ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর তার পরিচালনার জন্য একটি ছাপানো কনস্টিটিউশন বই ছিল। সেই সংবিধান অনুযায়ী সভ্য হবার বয়সসীমা ছিল ন্যূনতম ২১ বছর। একমাত্র চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কেউ এখানকার সদস্য হতে পারত না। চাঁদার পরিমাণ ছিল ৫০ পয়সা। পরবর্তীতে তা ১ টাকা হয়। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা নিঃসন্দেহে বেশি। একসময় ক্লাবের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৩০-১৪০ জন। ১৯৭৩ সালে চাঁদা বেড়ে হয় ২ টাকা। মজার কথা হল, আজও এই দুর্মূল্যের বাজারে ক্লাব

সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক ১০ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হয়। কোচবিহার ক্লাব তৈরি হবার পর তার চারধার দিয়ে লাগানো হয়েছিল কাঁটাতার আর মেহেদি গাছের বেড়া। সীমানা বরাবর ছিল শিরীষ, বকুল, ওক, দেবদারু, ইউক্যালিপ্টাস, মেহগনির মতো গাছ। পরে অবশ্য আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি গাছও লাগানো হয়েছিল। ক্লাবের পূর্ব দিকে ছিল তিনটি লন টেনিস কোর্ট, পশ্চিমের কোর্টে ব্যাডমিন্টন খেলা হত। আর ভিতরের প্রথম ঘরে চলত তাস, দাবা ও পাশা খেলা। সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ছিল খুব সুন্দর। ক্লাবে দেশীয় প্রথায় মেঝেতে ফরাশ করে তাকিয়াসহ আরাম করে বসার ব্যবস্থা করা ছিল। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ব্রিজ খেলা হয়। ক্লাবের বৈশিষ্ট্য হল, এখনও এখানে ষাটোর্ধ্ব সদস্যসংখ্যাই বেশি। ক্লাবে একসময় 'বেঙ্গল লাইব্রেরি' নামে একটি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কোচবিহার ক্লাব যেহেতু সান্ধ্য ক্লাব ছিল, তাই একসময় এখানে হার্ড ড্রিঙ্কসও পাওয়া যেত। কোচবিহার ভারতভুক্তির পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কোচবিহার ক্লাবে একসময় হত বিলিয়ার্ড খেলা। মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে করে তিনটি বিলিয়ার্ড বোর্ড আনিয়েছিলেন। একটি মহারাজা ক্লাবের জন্য, একটি রাজপ্রাসাদে নিজেদের খেলার জন্য এবং অন্য বোর্ডটি কোচবিহার ক্লাবকে উপহার দেন। বহু বছর নিয়ম করে এখানে বিলিয়ার্ড খেলা হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৮৬-র এক বিধ্বংসী ঝড়ে কোচবিহার ক্লাবের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়। টিনের চাল ঝড়ে উড়ে যায়। শিলাবৃষ্টিতে বিলিয়ার্ড বোর্ড নষ্ট হয়ে যায়। বোর্ডের ভাঙা টুকরোগুলো আজও সদস্যরা রেখে দিয়েছেন। এই ঝড়ে শুধু বিলিয়ার্ড বোর্ড নয়, নষ্ট হয়ে গিয়েছে ক্লাবের বহু নথিপত্র। খেলাধুলায় কোচবিহার ক্লাবের বেশ সুনাম ছিল। ব্যাডমিন্টন এই ক্লাবের রক্তের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনে বাইরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্বও রয়েছে। বেশ কিছুদিন সেটাও বন্ধ রয়েছে। এটাকে আবার শুরু করা হবে বলে জানালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তপন বসাক। একসময় ক্লাবে ভাল ফুটবল টিম ছিল। বর্তমানে নেই। কিছুদিন আগে ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে প্রায় ৪০/৪৫ জন অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরবর্তীতে কলকাতায় একটি ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় স্তরের জন্য ক্যারাটের যে দল নির্বাচিত হবে, তার জন্য কোচবিহার ক্লাবের ৫ জন অংশ নেবে। নতুন করে আবার ক্রিকেট টিম চালু করার ইচ্ছে রয়েছে। বর্তমানে ক্লাবের তরফ থেকে প্রতি সপ্তাহে জুডো, ক্যারাটে শেখানো হয়। এখানে টেবিল টেনিস খেলাও চালু আছে।

এ তো গেল খেলাধুলার কথা। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও একসময় এর বেশ নামডাক ছিল। এই ক্লাবে সুরকার কমল দাশগুপ্তর সঙ্গে কবি নজরুল ইসলাম এসেছেন বেশ কয়েকবার। একবার কোচবিহার ক্লাবে সাহিত্যিক ও গীতিকার শৈলেন রায় একটি অনুষ্ঠানে পঙ্কজকুমার মল্লিককে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল, পঙ্কজ মল্লিক গেয়েছিলেন 'প্রখর তপন তাপে'। ১৯২৪ সালে প্রথম 'কর্ণার্জুন' নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যজগতে নিজেকে প্রমাণ করে কোচবিহার ক্লাব। এর পর বহু নাটক মঞ্চস্থ করা হয় ক্লাবের তরফ থেকে। তার মধ্যে— মগের মুলুক, কৃষ্ণ সুদামা, কারাগার, মিশর কুমারী, ইরানের রানি, রীতিমত নাটক, চিরকুমার সভা, ব্যাপিকা বিদায়, খনা, সিন্ধু গৌরব, রায়গড়, মানময়ী গার্লস হাইস্কুল, চন্দ্রগুপ্ত, চাঁদ সদাগর, মাটির ঘর, ঝরা ফুল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকগুলোতে মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করতেন। বেশ কিছু বছর কোচবিহার নাট্যজগতে নামডাক ছিল কোচবিহার ক্লাবের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একসময় এই নাট্যচর্চা একেবারে হারিয়ে যায়।

কোচবিহার ক্লাবের সব চাইতে প্রবীণ সদস্য হলেন পাটাকুড়ার জগৎমোহন চক্রবর্তী। ১৯৫৫ সালে এই ক্লাবের সদস্য হন তিনি। আজও ৯০ বছরের অশক্ত শরীর নিয়ে নিয়ম করে সন্ধেবেলা চলে আসেন ক্লাবে তাস-দাবার আকর্ষণে। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্রের কোনও নিষেধই তাঁকে ক্লাবে আসা থেকে আটকাতে পারে না। বয়সজনিত কারণে কানে কিছুটা কম শোনেন, স্মৃতিশক্তিও খানিকটা দুর্বল। তবুও শোনালেন তাঁর সদস্য হবার অভিজ্ঞতার ইতিহাস। ১৯৫৫ সালে কোর্টে চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন তিনি। কিন্তু প্রত্যেকবারই কালো বলের চক্করে সদস্য হওয়া আর হয় না। তা-ও তিনবারের প্রচেষ্টায় সেই সদস্যপদ জোটে। কোচবিহার ক্লাবে সদস্য হওয়ার তখন একটা নিয়ম ছিল। ভোট নিয়ে সদস্যপদ দেওয়া হত। ইংল্যান্ডের বড় বড় ক্লাবের মতো এখানেও তার জন্যে ব্যবহার

কোচবিহার ক্লাবের সব চাইতে প্রবীণ সদস্য জগৎমোহন চক্রবর্তী

> ১৯৫৫ সালে কোর্টে চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন জগৎমোহন চক্রবর্তী। কিন্তু প্রত্যেকবারই কালো বলের চক্করে সদস্য হওয়া আর হয় না। তা-ও তিনবারের প্রচেষ্টায় সেই সদস্যপদ জোটে। কোচবিহার ক্লাবে সদস্য হওয়ার তখন একটা নিয়ম ছিল। ভোট নিয়ে সদস্যপদ দেওয়া হত। ইংল্যান্ডের বড় বড় ক্লাবের মতো এখানেও তার জন্যে ব্যবহার করা হত সাদা ও কালো বল। সাদা বল পক্ষে, কালো বিপক্ষে।

করা হত সাদা ও কালো বল। সাদা বল পক্ষে, কালো বিপক্ষে। একটা কালো বল ৫টা সাদা বল নষ্ট করত। এভাবে যোগ-বিয়োগ করে অন্তত ১২টা সাদা বল যাঁর পক্ষে থাকবে, তিনি সদস্য হতে পারবেন। পরবর্তীতে এই নিয়ম শিথিল হয় বলে জানালেন জগৎমোহনবাবু। বললেন, সে সময় ক্লাবের অবস্থা খুব খারাপ। কেয়ারটেকার মহেন্দ্রর ৬ টাকা মাইনে দেওয়া দূর অস্ত, 'যুগান্তর' কাগজের দাম দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখন সদস্য চাঁদা ৫০ পয়সা, কিন্তু সদস্যসংখ্যা মাত্র ১২/১৩ জন। তবুও অনেক কষ্টে ক্লাবকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন তাঁরা। বর্তমানে সদস্যসংখ্যা একশোর কাছাকাছি।

২০১৮ সালে ক্লাবের দুর্গা পুজোর ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। সেই কারণে এই বছর থেকে আগামী এক বছরব্যাপী ক্লাবের তরফ থেকে রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর আগে এখানে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, ডায়াবেটিস রোগ পরীক্ষা শিবির হয়েছিল। এই শিবিরগুলো আবারও হবে। আগামী এক বছর উত্তরবঙ্গব্যাপী টেবিল টেনিস, ক্যারমসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাবারও ইচ্ছে রয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষর— এমনটাই জানান বর্তমান সেক্রেটারি প্রদীপ লাখোটিয়া।

বর্তমান দেশবন্ধু মার্কেট যে জায়গায় রয়েছে, সেটিও কোচবিহার ক্লাবের জায়গা। পৌরসভাকে শর্তভিত্তিক ৯৯ বছরের লিজ দেওয়া রয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় তৎকালীন বউবাজারের দোকানিদের রাস্তা থেকে উৎখাত করা হয়। প্রশাসনের অনুরোধে কোচবিহার ক্লাবের জমিতে তাদের বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেসব ভাড়া এখনও বাকি পড়ে আছে। ক্লাব চালাতে গেলে যে আর্থিক সংগতির প্রয়োজন তা তাদের নেই। ফলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয় ক্লাবঘর। বর্তমানে ক্লাবে ঘরের সংখ্যা ৬। সম্প্রতি ঘরগুলি সংস্কারের কাজ চলছে। জানা গেল, দু'বছর পরপর ক্লাবে নতুন কমিটি তৈরি হয়। ক্লাবের পূর্ব দিকে রয়েছে অডিটোরিয়াম। পুরসভার পক্ষ থেকে এটি সম্পূর্ণ তৈরি করে দেবার কথা থাকলেও এত বছরেও তা করা হয়নি। তবে জানা গেল, অডিটোরিয়ামের যে কাজ বাকি রয়েছে তা অতি দ্রুত শেষ করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন বর্তমান পুরপ্রধান।

রাজ্য সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী রাজ্যে বিভিন্ন জেলার ক্লাবগুলোকে প্রতি বছর অনুদান দেওয়া হয় নানান কর্মকাণ্ডের জন্য। অথচ আবেদন করেও আজ পর্যন্ত এক টাকাও অনুদান মেলেনি এই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের। ক্লাবেরই সদস্য সুব্রত সাহা জানান, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফরের সময় যুবকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিককে এই বিষয়ে আবার জানানো হয়েছে। আশা করছি, এ বছর ক্লাবের জন্য অনুদান পেয়ে যাব।

১৯৯৮ সালে কোচবিহার ক্লাবের শতবর্ষপূর্তি উৎসবে কোচবিহারের রাজকুমারী তথা জয়পুরের মহারানি গায়ত্রীদেবী এসেছিলেন। শতবর্ষে ক্লাবের তরফ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে ক্লাবের প্রাচীন সদস্যরা অতীতচারণ করেছেন। সেইসব লেখা থেকে জানা যায়, তখন সদস্যরা কতটা 'ক্লাব মাইন্ডেড' ছিলেন। সেসব দিনে খেলা, আড্ডা, রসিকতায় জমে উঠত প্রতিটি সন্ধ্যা। এলিট ক্লাব হিসেবে যার সূচনা, তার কিছুই আজ প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও হারানো দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সদস্যরা বদ্ধপরিকর। নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী এই কোচবিহার ক্লাব। অতীত গৌরব নিয়ে আজও সে তার পথ চলছে। নতুন প্রজন্মের হাতে এখন তার সোনালি অতীতকে বাঁচিয়ে রাখার ভার।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

হারিয়ে যায় হাড়িয়া-জুয়া-হপ্তার হাট
গ্রামীণ ডুয়ার্সের মিলনমেলা

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

'হাট বসেছে শুক্রবারে—
বক্সিগঞ্জে পদ্মাপারে—'

হাটবাজার শুধুমাত্র বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের একটা প্রাচীনতম মঞ্চ নয়— এলাকার মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য পরিচিতি বহন করে এই সমস্ত হাটবাজার। সাধারণভাবে হাট সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন বসে, সেখানে বাজারটা প্রাত্যহিক ব্যাপার। সারা বাংলায় মূলত হাট বসত নদী সংলগ্ন মাঠে— কারণ ব্যাপারীদের মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য জলপথ ব্যবহার করা হত। ডুয়ার্সের নদীর চরিত্র ভিন্ন। সারা বছর নদীতে জল থাকে না। শীতে অধিকাংশ ডুয়ার্সের নদী শুকনো খটখটে। আবার বর্ষায় ভয়ংকরী। এখানে জলপথ ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই ডুয়ার্সের হাট লোকালয় সংলগ্ন স্থানে, চা-বাগানের কোল ঘেঁষে অথবা বনবস্তির প্রান্তে প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সংগঠিত হয়।

জনপদ তৈরি হওয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে শুরু হয় হাটবাজার। তারপর নানা কারণে হাটের স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। কখনও বন্যায় বা আগুন লেগে হাট ধ্বংস হয়েছে। রাস্তার ধারে হাটের দিন প্রবল ভিড়ের চাপে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটার কারণে হাটের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্থানে এখনও রাস্তার ধারে হাট বসে এবং ভিড়ের কারণে যানবাহন চলাচলে অসুবিধে হয়। ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজারের রাস্তায় পথের ধারে লক্ষ্মীর হাট, বোলবাড়ি হাট, মঙ্গলবাড়ি হাট থাকায়— এখনও হাটের দিন রাস্তায় যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ব্রিটিশ শাসনকালে এই হাটগুলো জেলাশাসকের মার্কেট ফান্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। হাটগুলো ইজারা দেওয়া হয় এবং সরকারের তহবিল জমতে শুরু করে। ১৯৯০ সনে মার্কেট ফান্ড দপ্তরের দায়িত্ব জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। ডুয়ার্সের জনবসতির একটা বড় অংশ গড়ে উঠেছিল মার্কেট ফান্ডের জমির উপর। মাল, মেটেলি, ময়নাগুড়ি, বীরপাড়া, বানারহাট, হ্যামিলটনগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার বহু বাড়িঘর, দোকানপাট মার্কেট ফান্ডের জমির উপর গড়ে ওঠে। ওইসব জমির পাট্টা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু জমির পরিমাণ ও মালিকানা নির্ধারণে বিভ্রাট তৈরি হওয়ায় সেই চেষ্টা বাস্তবায়িত হয়নি। ওই জমিতে বাড়ি তৈরির আইনগত মঞ্জুরি নেই— গৃহঋণের সুবিধা পাওয়া যায় না। বেশ কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের একজন পদস্থ আধিকারিক সুশান্ত মণ্ডল বলেছিলেন, মার্কেট ফান্ডের ওই সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এতসব তত্ত্বকথা আমাদের বিষয় নয়— হাটকে ঘিরে এলাকার ব্যবসাবাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাটুকুতেই আমরা আজ সীমাবদ্ধ থাকব।

১৯৭৯-৮০ সনে কোচবিহারের কর্মক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। একদিন চোখে পড়ল, কোচবিহার-বাণেশ্বরের পথে শয়ে শয়ে তক্তপোশ এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ঠেলায় চেপে চলেছে। জেনেছিলাম সেই ডোডেয়ারহাটে আসবাবপত্র বেচাকেনাই তখন মূল ব্যবসা। ওই সময় দিনহাটা, সিতাই, মাথাভাঙা এবং মেখলিগঞ্জে রবি মরশুমে তামাক চাষ হত। জলপাইগুড়ি জেলার মেখলিগঞ্জ সংলগ্ন অঞ্চলেও তামাক চাষের প্রচলন ছিল। রাজারহাট, ভোটপট্টি, হুসলুর ডাঙা হাটে একসময় প্রচুর তামাক বিক্রি হত। আমাদের শৈশবে বাগরাকোট হাটে প্রচুর মাখন বিক্রি হত। বাগরাকোটের ছোট্ট হাটে বেশ কিছু জার্সি গাভি বিক্রির জন্য আনা হত।

হাটের ডুয়ার্স মনে এলেই আমার শৈশবে বেতগুড়ি চা-বাগানে এক ঝড়জলের দিনে হাটের কথা মনে পড়ে। চা-বাগানের প্রাইমারি স্কুলের সংলগ্ন এলাকা জুড়ে হাট। মেরেকেটে ত্রিশ-চল্লিশটা দোকান। সেখানে মাছ থেকে মশলার দোকান বা দু'-চারটে তরিতরকারির দোকান বসত। হাটে কিছু বিস্কুট, কেক ও ফুলুরির দোকান বসত, কিন্তু আমাদের কাছে পয়সা থাকত না। তাই রবারের বল বা পুতুল কিছুই কেনা হয়নি। একদিকে থলথলে শুয়োরের মাংস, অন্য দিকে খাসি, পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল। আর এখনও ডুয়ার্সের হাটের ট্রেডমার্ক

হাড়িয়ার দোকান। হাটবাজার করে দু'পাত্তর হাড়িয়া মেরে বুঁদ হয়ে আদিবাসী চা-বাগান শ্রমিকরা বাড়ি ফিরত। হাড়িয়ার দোকান মানে খুব বড় ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে হাড়িয়ার সম্ভার। বাটির মাপে বিক্রি হত। বিক্রেতা আদিবাসী মহিলারা আর ক্রেতা মহিলা-পুরুষ উভয়েই। সে দিন দুপুরে আমরা প্রাইমারি স্কুলে। হঠাৎ আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, বিদ্যুতের ঝলকানি। ঘন ঘন গভীর মেঘের ডাক। হাটের মাঝে বট গাছের গোড়ায় আছড়ে পড়ল বাজ। কানফাটা বিকট শব্দ— চারদিক আলোয় ভরে গেল। আমরা ভয়ে কেঁদে ফেললাম। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। হঠাৎ দেখি রাঙাকাকা ছাতা মাথায় হাজির— আমাকে নিয়ে বাসায় এল।

হাড়িয়ার কথায় আমার দুটো ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে। একবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি এসে সন্ধেবেলায় প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে তিনি ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানে অরিজিনাল হাড়িয়ার স্বাদ নিতে গিয়েছিলেন। আর-একবার আমাদের অনেক সিনিয়র এক সরকারি অফিসার ভাদুড়ি সাহেব এসে লাটাগুড়িতে অহিনদের রিসর্টে মদের মচ্ছব করেছিলেন। পরদিন তাঁকে জলপাইগুড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে তিনি খুব কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন, 'কাল নদীর ওপারে নেওড়া চা-বাগানে যাব হাড়িয়া খেতে। এখনও তার স্বাদ নেওয়া হয়নি।' মনে হল, বহুপ্রতীক্ষিত কোনও প্রাপ্তি আছে— তা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

চা-বাগান সংলগ্ন বন্দরগুলো, যেমন— মালবাজার, ওদলাবাড়ি, মাটিগাড়া, বীরপাড়া ইত্যাদি স্থানে রবিবার হাট বসত। কারণ অধিকাংশ চা-বাগানে রবিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বিভিন্ন চা-বাগান থেকে ট্রাকে চেপে বাবুরা এবং কিছু শ্রমিক একসঙ্গে বাগান থেকে ১০ থেকে ২০ মাইল দূরে হাটে যেত। সারা সপ্তাহের সবজি, মুড়ি-চিঁড়ে, ঝুড়িতে ডিম এবং দু'-তিন দিনের মাছ নিয়ে দুপুরে আবার সেই ট্রাকে সবাই বাগানে ফিরত। আসলে ওই হাটগুলো ছিল সমতলের শপিং মল। বাসনপত্র, জামাকাপড়, জুতোর সঙ্গে টিনের তোরঙ্গ বা চামড়ার সুটকেস পাওয়া যেত। পুরনো ব্যবহৃত পোশাকের দোকান থেকে সুগন্ধি তেল ও রূপচর্চাসামগ্রীর দোকান থাকত। যে কোনওরকম খাদ্যসামগ্রী থেকে বাতের অব্যর্থ নিরাময়ে তেল পাওয়া যেত। হাটে চোঙা ফুঁকিয়ে বিড়ির প্রচার চলত। কিছু ছেলে মহিলা সেজে চটুল হিন্দি গানের সঙ্গে দুরন্ত নাচে দর্শক আকর্ষণ করে বেলপাতা বিড়ি বিক্রি করত। ওই নাচ দেখা নিষিদ্ধ ছিল বলে লুকিয়ে বহুবার দেখেছি।

কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যাপারে যেমন

ধূপগুড়ি, তেমনই গবাদি পশু বিক্রির জন্য গৌরীহাট, সোনাপুরহাট, মাটিগাড়াহাট ছিল বিখ্যাত। মাদারিহাটে কাঠের দামি আসবাব থেকে ঘরবাড়ির মজবুত দরজা-জানালা বিক্রি হত। অবশ্য ওই ব্যবসা এগিয়েছিল সরকারি করাতকলের সৌজন্যে। কাঠের আসবাবপত্র এখন অত্যন্ত মহার্ঘ। কাঠের উপর যত সরকারি নিয়ন্ত্রণ চেপে বসছে, ততই কাঠ চোরেরা জঙ্গলের সম্পদ কেটে সাফ করে ফেলছে। পশ্চিমবঙ্গের বোধহয় সবচেয়ে বড় পাটি শিল্পের জায়গা কোচবিহার শহর সংলগ্ন ধলুয়াবাড়ি এবং ওখানকার হাটের মূল বেচাকেনা পাটি এবং পাটি দিয়ে তৈরি নানা শৌখিন ব্যাগ ও ঘর সাজানোর জিনিস। পাটি দিয়ে বানানো একটা হাফহাতা জ্যাকেট দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বেশ বড় বড় মেলা বসে। তবে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় মেলা বোধহয় কোচবিহারের রাস মেলা। তেমনই জলপাইগুড়ি জেলায় জল্পেশ মেলা খুব বিখ্যাত। দুর্গা পুজো-কালী পুজোর সময় ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় মেলা বসে। কালী পুজোর সময় বানারহাট এবং হ্যামিলটনগঞ্জের মেলার খুব জাঁকজমক। মেলার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, দৈনন্দিন আহারের চাল-ডাল-তেল-মশলা, তরিতরকারি, মাছ-মাংস— সবই মেলায় পাওয়া যায়।

কালী পুজোর সময় ডুয়ার্সের মেলাগুলোতে নানারকম জুয়া খেলার প্রচলন আছে। তার মধ্যে ঘুটঘুটি খেলাতে লেনদেন বেশি হয়। মেলার একদম প্রান্তে জুয়ার আসর এখনও বসে। মাঝে মাঝেই পুলিশ হানা দেয়। পালানোর সুবিধার জন্যই মেলার প্রান্তে জুয়ার কেন্দ্র।

কালের নিয়মে বহু হাট চিরতরে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তেমনই একটা হাট ছিল জলপাইগুড়ি শহরের ৪ নং গুমটিতে রেল লাইনের ধারে। আমি তখন কিশোর, স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র; প্রায়ই বাড়ি থেকে হাটে পাঠাত আমাকে। জমজমাট হাট বসত। গ্রাম থেকে বহু মানুষ শাকসবজি, হাঁস-মুরগি, চাল, খই-মুড়ির দোকান বসাত। ওই বাটে কচ্ছপের মাংস বিক্রি হত। ১৯৬৮-র বন্যার পর ধীরে ধীরে হাটটির মৃত্যু ঘটে। ঠিক সেই সময়টাতেই বা আরও কিছু পরে একটা গ্রামীণ হাটের জন্ম দেখেছি। ময়নাগুড়ি রোডে রাস্তার ধারে গুটিকতক লোক গ্রাম থেকে সবজি এনে বিক্রি করত। এখন সেখানে শত শত যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকে হাট থেকে আনাজপত্র বিভিন্ন শহরের বাজারে পৌঁছে দিতে।

হলদিবাড়ির কাঁচালংকা বা টম্যাটোর চাহিদা দিল্লিতেও যথেষ্ট তাই শনিবারের হাটে বিশাল চেহারার ট্রাকে কাঁচা সবজি বোঝাই হয়ে দিল্লি পর্যন্ত যাত্রা করে। বহু মানুষ এই ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন।

রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকে কিষান মান্ডি তৈরি করেছে। নীল-সাদা রঙের ঝকঝকে দালান, গুদামঘর। আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের পর কেন যে মাসের পর মাস অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, বোধগম্য হল না। গ্রামের হাটে সরকারি খরচে সুন্দর দালান তৈরি করে তার নামকরণ করা হয়েছে 'কর্মতীর্থ'। ওই দালানবাড়ি থেকে গ্রামের মহিলাদের নিজেদের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রি হওয়ার কথা। কিন্তু সেগুলো উদ্‌বোধনের পর থেকেই তালাবন্ধ হয়ে কেন পড়ে থাকে?

তবে গ্রামীণ হাট স্থানীয় মানুষদের বিনোদনের জায়গাও বলা যায়। নানা জায়গার মানুষ এসে মিলিত হয়। লাগাতার আড্ডা, হইচই। অল্পস্বল্প চোলাই বিক্রি বা জুয়ার ঠেক বাদ দিলে, হাটে এলে এলাকার সংস্কৃতির একটা চিত্রও পাওয়া যায়। বারবার কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীতে তাই হাটের চিত্র ফুটে ওঠে।

অপুর সঙ্গে চুটিয়ে চারটে দিন

দিন কয়েক আগে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে নাকি দেখা গিয়েছিল বব বিশ্বাসকে বন্দুক নয়, ক্যামেরা হাতে! শিলিগুড়ির দু'-একজনকে আবার বিস্ময় প্রকাশ করতে শোনা গেল, গোয়েন্দা অফিসার শবর দাসগুপ্ত নাকি দেশবন্ধুপাড়ায় এসেছিলেন বিশেষ তদন্তের কাজে। তা শুনে কেউ কেউ উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ছাড় তো ওসব গুজব। ক'দিন আগে কালিম্পঙে কাকে দেখে এলাম জানিস? জগ্গা জাসুস! যে যাই দেখুক বা বলুক আসল স্কুপ এবার কেবল মাত্র 'এখন ডুয়ার্স'-এই। এক্সক্লুসিভ স্টোরি হিসেবে।

'বব বিশ্বাস' নামটা শুনলে আমাদের চোখে যে মুখটা ভেসে ওঠে, সেটি বলাই বাহুল্য রুপোলি পরদার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। বাংলা টেলিভিশনের দাক্ষিণ্যে সেই মুখ অবশ্য এখন অনেক বেশি পরিচিত 'অপু' নামে। সেই অপুর ফোন পেলাম হঠাৎ কয়েকদিন আগে। খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম। কারণ যদিও সে দীর্ঘদিন ধরে ডুয়ার্স তথা উত্তরবাংলার নিয়মিত 'ভিজিটর', কিন্তু ইদানীং সে তো শুনেছি শুটিং নিয়ে ভীষণ ভীষণ ব্যস্ত, দম ফেলার ফুরসত নেই। শুনেছি, অনুরাগ বসুর নতুন ছবি 'জগ্গা জাসুস'-এ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছে সে, তাই বেশির ভাগ সময় মুম্বইতেই থাকতে হচ্ছে তাকে। তার উপর 'অপুর সংসার' টিভি প্রোগ্রাম শুটিং-এর জন্য কলকাতাতেও ছুটে ছুটে আসতে হচ্ছে। কাজেই এ সময় তার ফোন স্বাভাবিকভাবেই অপ্রত্যাশিত।

ফোনে প্রথমেই তার ব্যাখ্যা দিল অপু নিজেই। এই ভয়ানক কাজের চাপে একটা

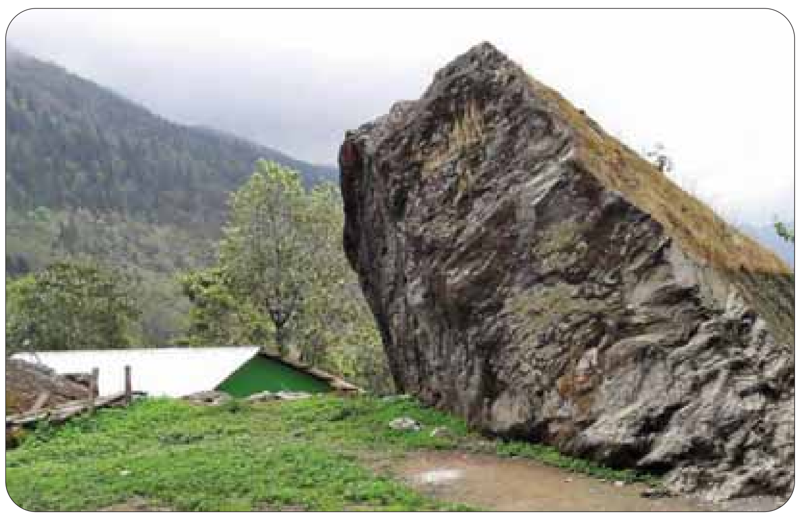

‘ব্রেক’ চাইছে ওর শরীর ও মন। রোজকার লাইট-ক্যামেরা-সাউন্ড-রোল-অ্যাকশন-কাট নিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে সে। সৌভাগ্যবশত তিন-চার দিনের একটা ছুটি মিলেছে, তাই সেই ক'টা দিন আমাদের উত্তরবঙ্গের জঙ্গল-পাহাড়ে পালিয়ে থাকতে চাইছে। আকাশের নিচে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে চাইছে ক'টা দিন। বেশ তো, চলে এসো, উদার আহ্বান জানাই ফোনেই। লাটাগুড়ির চিরপরিচিত ‘পঞ্চবটী’ই তার প্রথম চয়েস, কিন্তু বিধি বাম। ‘পঞ্চবটী’ সে সময় হাউসফুল। অতএব চলো পাহাড়ের কোনও নিরিবিলি কোণে। আমার প্রিয় দু'-একটা জায়গার নাম বললাম। অপু রাজি। তার পরদিন ফোন করে জানাল, বুকিং-টুকিং সব করা হয়ে গিয়েছে, তুমি রেডি থেকো।

যথাসময়ে অপু এল। বাগডোগরায় নেমে সোজা আমাদের বাড়িতে। চটপট মধ্যাহ্নভোজন সেরে ক্যামেরা বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। আজকের দিনটা আমরা কাটাব আশপাশেই। শিলিগুড়ি শহর পেরিয়ে গাজলডোবায় নিয়ে গেলাম ওকে। ঝকঝকে রাস্তাঘাট, মনোরম খোলামেলা প্রকৃতির মাঝে বহুদিন পরে এসে অপু বিস্মিত-উল্লসিত-উত্তেজিত। ঠিক এইটাই চাইছিলাম বাচ্চুদা। আমিও খুশি, কারণ অনেকদিন বাদে ওকে এরকম একা পেয়েছি। মনে হল, একদম আগের মতোই

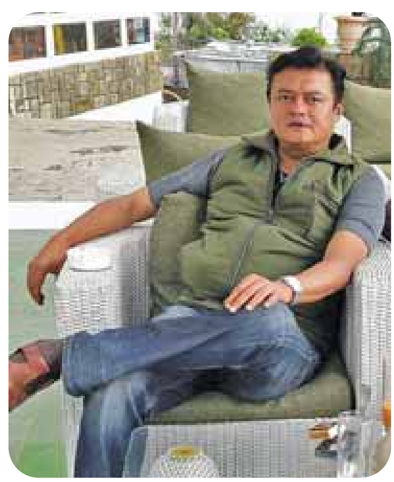

অপুর সঙ্গে লেখক

একই রকম রয়ে গিয়েছে আমাদের 'অপু', অভ্যাসটুকু বদলায়নি।

কিন্তু অপু না বদলালেও দিনকাল আর চারপাশটা যে পালটে গিয়েছে, সেটা টের পেলাম খানিক বাদেই। অপুর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ওকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে বারবার। এদিকে লোকজনের ভিড় নেই, তবু মানুষ চিনে ফেলছে ওকে, অটোগ্রাফ-সেল্‌ফির জন্য হামলে পড়ছে। আর মোবাইল-ফেসবুকের দৌলতে সে খবর ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। গাজলডোবা থেকে এগিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। একটা সুন্দর জায়গা দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। বৃষ্টি-ধোয়া জঙ্গলে মাটি থেকে উঠে আসছিল সোঁদা গন্ধ। নিচে গালিচার মতো বিছানো ঝরা পাতা আর গাছের ডালে ডালে উঁকি দিচ্ছে কচি কচি সবুজ পাতা। অপুর চোখে-মুখে পরম তৃপ্তি। স্বগতোক্তি করল, শহরের এত কাছে এত সুন্দর জায়গা, সত্যিই তোমরা ভাগ্যবান।

জঙ্গল ছাড়িয়ে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম চা-বাগানের রাস্তায়। স্বরমাতিপুর চা-বাগান। সবুজ গালিচার মতো বাগানের মধ্যে দিয়ে সরু পিচ-ঢালা পথ। হঠাৎ পিছন থেকে পাঁচ-ছ'টা বাইক এসে আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। বাইকে জনা দশ-বারো যুবক। পোশাক-আশাকে শহুরেই মনে হল। কী ব্যাপার ভাই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে বুঝলাম, ওরা সবাই ব্যাঙ্ককর্মী এবং অপুর ফ্যান। মোবাইলে খবর পেয়েছে, এই এলাকায় তাদের 'হিরো'কে নাকি দেখা গিয়েছে। খবর পেয়েই জলপাইগুড়ি থেকে বাইক উড়িয়ে চলে এসেছে, তারপর খুঁজে খুঁজে অবশেষ পেয়েছে গাড়িটাকে। তাদের প্রিয় নায়কের সঙ্গে ছবি তোলার অমূল্য সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্ন নেই। ওদের ক্রমাগত অনুনয়-বিনয়ে অপু গাড়ি থেকে নামল, এবং তার পরবর্তী কিছু সময় ধরে চলল ছবি তোলার পালা, যতক্ষণ না ওদের ইচ্ছেপূরণ না হয়, ততক্ষণ।

এখানে চা-বাগান আর গভীর জঙ্গল যেন নিবিড়ভাবে একে অন্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে। এখানে লেপার্ড-হাতির অবারিত আনাগোনা চলে, কারণ এখানে মানুষের চলাফেরা অনেক কম। একটা জায়গায় গাছের গায়ে 'এলিফ্যান্ট করিডর' লেখা সাইনবোর্ড দেখে অপু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। দিনের আলো পড়ে আসছে দ্রুত। গাড়ির চালকের সতর্কবাণী শুনলাম, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এখনও বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে, আর এখানে এখন দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না, কারণ এটাই মহাকালবাবাদের বার হওয়ার সময়। অগত্যা ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। গাড়ি আবার ছুটল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শহর অভিমুখে।

রাতে অপুর সঙ্গে বসেই সপরিবার দেখলাম ওর জনপ্রিয় টিভি শো 'অপুর সংসার'। হঠাৎ এমন নামকরণ কেন? প্রশ্নের উত্তর দিল অপু, বাবা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীমহলে যথেষ্ট প্রিয় ছিলেন, তাই ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে ফিল্মের লোকেদের আনাগোনা দেখে এসেছে। সবাই জেঠু-কাকু-পিসি-মাসি কিংবা ভাই-বোন-বন্ধু। পুরোটাই একটা সংসার। সেই ভাবনা থেকেই শুরু এবং চালু অপুর সংসার। খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অপুর মুখ থেকে শুনছিলাম শুটিং-এর নানা অভিজ্ঞতার কাহিনি। সেই সন্ধ্যায় মনে হচ্ছিল, বহুদিন বাদে অপু যেন মনের কথা খুলে বলার মতো লোক পেয়েছে।

পরদিন সকালে অপুর পাহাড়যাত্রা। কিন্তু সে তো একা যাবে না, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে, নাছোড়বান্দা। কারণ অপুর স্ত্রী মহুয়া নাকি বুকিং দু'জনের জন্যই করে দিয়েছে। অগত্যা নিজের কাজকর্ম গুটিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়া। এই সুযোগ যে দ্বিতীয়বার আসবে না, সেটাও তো মাথায় রাখতে হবে! আমাদের গন্তব্য কালিম্পং শহর পেরিয়ে ডেলো পাহাড় থেকে চার কিলোমিটার দূরে 'আপার ইছে' গ্রামের মাথায় হাল আমলের তৈরি রিসর্ট 'দ্য ইয়াখা'। চমৎকার পরিবেশ, এবং নির্মাণশৈলীর তারিফ করতেই হয়। টপ ফ্লোরের পুরোটা জুড়েই 'সুইট'; অপুর স্ত্রী আমাদের জন্য বুক করে রেখেছে। বিশাল বিশাল বসবার জায়গা, ব্যালকনি, ডাইনিং, জিম— সব মিলিয়ে রীতিমতো রাজকীয়। খানিকটা অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল দেখে অপু হেসে আশ্বস্ত করল, এইটুকু বিলাসিতা উপভোগ করার যোগ্যতা বোধহয় অর্জন করেছি দাদা। অতএব রিল্যাক্স করো।

যারা অপুর সঙ্গে কাটিয়েছে, তারাই জানে, মানুষ হিসেবে অপু তুলনাহীন। আর ওর সঙ্গে টানা চারটে দিন ছুটি কাটানো যে কারও জীবনেই উপরি পাওনা। পাহাড়ের শীতল পরিবেশ অর্থাৎ ন্যাচারাল এসি-তে দুটো রাত কাটালাম বিলাসবহুল আলস্যে। অপুকে দেখলাম, এই দুটো দিনের বিশ্রাম যেন চেটেপুটে নিংড়ে বার করে নিল। সকাল-বিকেল-সন্ধেয় ছিল খাওয়াদাওয়ার এলাহি আয়োজন, অবশ্যই তা বব বিশ্বাসের অনারেই। দুপুরে ছুটির মেজাজে ভোজন এবং তারপর সংক্ষিপ্ত দিবানিদ্রা। বিকেলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দার্জিলিং চায়ের মৌতাত এবং সন্ধেয় কুয়াশা ঘেরা নির্জনতায় ব্যালকনিতে অনবদ্য মজলিশ, সীমাহীন বকবকানি। রাতে নিবিড় ঘুম। কোথা দিয়ে যে কেটে গেল সময়, টেরই পেলাম না। দ্বিতীয় দিন সকালে অপুকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম একটু আশপাশটা ঘুরে দেখতে। গিয়েছিলাম মনসুঙের শতাব্দীপ্রাচীন 'জলসা' বাংলোতেও। আগাগোড়াই অপুর সঙ্গী ছিল ওর ক্যামেরা।

চতুর্থ দিন। অপুর ছুটি শেষ। সকাল সকাল প্রাতরাশ সেরেই নেমে এলাম শিলিগুড়ি। মধ্যাহ্নভোজন পর্ব সারা হল ঝটিতি। তারপর সোজা বাগডোগরা। কথা হল, সামনে এরকম একটা ছুটি পেলেই ও পুরো 'অপুর সংসার' নিয়ে আসবে জলদাপাড়ায়। ডুয়ার্স-তরাই-হিমালয় থেকে প্রচুর অক্সিজেন ফুসফুসে ভরে অপু উড়ে গেল মুম্বই। জানি, এবার ও ক্যামেরার সামনে ওর সেরাটুকু দেবে নিজেকে উজাড় করে। আমার স্থির বিশ্বাস, এবার খ্যাতির শিখরে পৌঁছে যাবে ও। যেখানেই পৌঁছাক, ওর স্মৃতির অসংখ্য ভিড়ে জেগে থাকবে চুরি করে পাওয়া এই চারটে দিন।

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

বাবা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীমহলে যথেষ্ট প্রিয় ছিলেন, তাই ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে ফিল্মের লোকেদের আনাগোনা দেখে এসেছে। সবাই জেঠু-কাকু-পিসি-মাসি কিংবা ভাই-বোন-বন্ধু। পুরোটাই একটা সংসার। সেই ভাবনা থেকেই শুরু এবং চালু অপুর সংসার।

বিশ্ব নৃত্য দিবস উদ্‌যাপন

২৯ এপ্রিল ২০১৭, উদ্‌যাপিত হল ডুয়ার্স আর্টস অ্যান্ড কালচার গিল্ডের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় এলিট পর্যটক আবাস-এর প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানটি শ্রী সুভাষ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রী প্রমথনাথ, শ্রী অমল চ্যাটার্জি, শ্রী পরিতোষ সাহা, প্রমুখ প্রদীপ প্রজ্জ্বলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা ঘটনা। তারপর শুরু হয় নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য কৌশল। কত্থক, ভারতনাট্যম, ওডিসি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় নৃত্য ছাড়াও শাস্ত্র মান্য রবীন্দ্র নৃত্য, লোক নৃত্য— এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় সমস্ত নৃত্য শাখা অনুষ্ঠানটিকে রঙ্গবহুল করে তোলে। দেবজয়া সরকার, রমা চক্রবর্তী, চন্দ্রানী মুখার্জি, শতাব্দী সেনগুপ্ত, নিবেদিতা দত্ত, অঙ্কিত সাহা, রিয়া ভৌমিক, শুক্লা মোহন্ত দাস, স্নেহা নিয়োগী, কল্পনা আইচ, দেবলিনা ঘোষ, অনামিকা রায়, নিবেদিতা ধর, স্নিগ্ধা রায়, সুপর্ণা দাস, বিকাশ সরকার, কমল সেন প্রমূখ সদস্য-সদস্যাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সার্থকতা লাভ করে। সুজিত সরকার, রাজা দাস, রামপদ বর্মন প্রমুখ সংস্থার কর্ণধারেরা এই বিশ্ব নৃত্য দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম সহযোগী।

সভাপতি সুভাষ সরকার মহাশয় জানান যে, আলিপুরদুয়ার জেলা তথা উত্তরবঙ্গের সমস্ত স্তরের নৃত্যশিল্পী তথা নৃত্য বিদ্যালয়গুলোর সহযোগিতায় এতদ্ অঞ্চলের শিল্পানুরাগীদের (নৃত্য) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্যে পারদর্শী করে তোলার প্রচেষ্টায় এই সংস্থা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী দেবজয়া সরকার যিনি দেশ বিদেশে কত্থক নৃত্যে পারদর্শীতার প্রমাণ রেখেছেন তিনি এই সংস্থার উদ্দেশ্য সফল করতে সর্বদাই সচেষ্ট। সম্পাদক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকার জানান যে, সংস্থা প্রতি বছর এই দিনটিকে পালন করে চলবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলিপুরদুয়ার চিত্রকলা প্রদর্শনী

আলিপুরদুয়ার ম্যাকইউলিয়াম হাইস্কুলের বিপরীতে নেতাজি পাদদেশে গত ৭ মে থেকে ৯ মে পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী আলিপুরদুয়ার আর্ট ক্লাবের উদ্যোগে চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর শুভ উদ্ভোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অশোক কুমার ভট্টাচার্য। আলিপুরদুয়ার আর্ট ক্লাবের মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল গোপেশ দাস, অভিষেক ঘোষ, রথীন ভাওয়াল, মৌমিতা দে এবং নিলাদ্রী ঘোষ। নিলাদ্রী ঘোষ বলেন চিত্র শিল্পীদের গুণগত মান তুলে ধরবার জন্যই হাজারো সমস্যার মধ্যেও শহরের পীঠস্থানে এই আয়োজন করা হয়েছে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে। নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা, সিন্টু দত্ত ও অতনু ভট্টাচার্য্য বলেন আলিপুরদুয়ার আর্ট ক্লাবের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় এবং শহরের নবীন প্রতিভারা উৎসাহিত হয়ে ভিড় করছে এটা ভাল লক্ষণ। এই প্রদর্শণীতে ভাল সাড়া মিলেছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মূকাভিনেতাকে সংবর্ধনা ছায়ানীড়ের

কলকাতার মূক আকাদেমীর ৩৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন কোচবিহারের মূকাভিনেতা স্বাগত পাল। সম্প্রতি কলকাতার শিশির মঞ্চে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে মুকাভিনয়ের জন্য উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দুই শিল্পীকে তারা সম্মানিত করে। পুস্পস্তবক ও মেডেল পড়িয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানান বিশিষ্ট অভিনেত্রী চন্দ্রা দেব। কোচবিহারের ছায়ানীড় নাটক ও নানা সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি মুকাভিনয় চর্চাও করে আসছে। ছায়ানীড়ের সম্পাদক স্বাগত পাল নিজে প্রয়াত বিশিষ্ট মুকাভিনেতা শংকর দত্তগুপ্তর ছাত্র। জানালেন, মুকাভিনয় শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাই এই সম্মান তার কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। ওই অনুষ্ঠানে মূক আকাদেমীর কর্ণধার ৬২ বছর বয়সি মুকুল দে-র একক মুকাভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মালবাজারে শুরু হল

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব

১০ মে-র বিকেলটা ছিল জমজমাট। 'কিশলয়' নামের ছোটদের স্কুল বাড়িটায় তখন মালবাজারের শ্রীমতীদের ভিড়। সবার হইচইয়ের মধ্যে শুরু হয়ে গেল শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব। এখানেও এই ক্লাবের কোনও সভাপতি, সেক্রেটারি বা কমিটি নেই, এখানে সবাই প্রধান। থাকার মধ্যে কেবল আছেন মীনাক্ষী ঘোষ, আহ্বায়ক হিসেবে। যিনি আপাতত ক্লাবের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটারই দায়িত্ব নিলেন। এবার তাঁকে সাহায্য করার জন্য ক'জন এগিয়ে আসবেন সেটাই দেখার।

এখানেও ক্লাব সদস্য হলে বছরভর 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা পাবেন বিনামূল্যে। সেই সঙ্গে মাসে একটা-দুটো আড্ডা, এদিক ওদিক ডে আউট ইত্যাদি রুটিন কাজকর্ম তো থাকছেই। আর এখানেও প্রথম দিনই শ্রীমতীরা এসে বললেন, এরকম একটা করে ক্লাব হওয়ার প্রয়োজন বোধহয় সব জায়গাতেই আছে— যেখানে আমরা মেয়েরা হপ্তাভর সংসারের ঘানি টেনে একটু ফুরসৎ পাই নিজেদের যতটা সম্ভব হাল্কা করার। তার সঙ্গে চা-টা তো আছেই।

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব শীগগিরই খুলবে ধূপগুড়িতেও। কোচবিহারেও উদ্যোগ চলছে বেশ ঘটা করে সূচনার। দেখা যাক কতদূর কী শেষ পর্যন্ত হয়।

'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে। আপনিও আপনার উদ্ভাবনী রন্ধনশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন আকর্ষণীয় কোনও রেসিপি পাঠিয়ে। মেল করুন 'এখন ডুয়ার্স'-এর ই-মেল আইডি-তে।

হেলদি ব্রেকফাস্ট

উপকরণ: ব্রকোলি, বিনস, গাজর, টম্যাটো, কর্ন, মটরশুঁটি ২টো, ডিম, চিকেন (হাড় ছাড়ানো) ৩/৪ পিস, ছোট পেঁয়াজ ১টা।

প্রণালী: সমস্ত সবজি আলাদা করে নুন দিয়ে সেদ্ধ করুন। মটরশুঁটি খোসাসুদ্ধ সেদ্ধ করুন, তারপর বিচিগুলো বার করুন। টম্যাটো গরম জলে ৩/৪ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন, তারপর খোসা টেনে তুলুন। একটি ডিম পোচ করুন, অন্য ডিমটি সেদ্ধ করুন। এবার চিকেনগুলো ছোট করে কেটে, ১টা ছোট পেঁয়াজ কুচিয়ে, ২ কাপ জল ও একটু নুন দিয়ে প্রেশার কুকারে দিয়ে, ৩/৪টে সিটি দিয়ে নামিয়ে নিন। চামচ দিয়ে চিকেনটা চটকে দিন। এবার ছাঁকনি দিয়ে চিকেনটা ছেঁকে স্যুপটা একটা বাটিতে দিন এবং আপনার পছন্দমতো সবজি ও ডিম প্লেটে সাজিয়ে দিন। উপর দিয়ে গোলমরিচ গুঁড়ো, বিটনুন ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন সকালের জলখাবারে, দেখবেন সকালটা একদম জমে যাবে।

কাঁচকলার কোপ্তা

রেসিপি: ডালিয়া রায় চৌধুরী

উপকরণ: ৩টে কাঁচকলা, ৪টে বড় সাইজের আলু, ২টো টম্যাটো, ২/৩টে লংকা, ১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, অল্প আদা বাটা, ৪ টেবিল চামচ দই, পরিমাণমতো চিনি, নুন, সামান্য গরম মশলা, ২/৩ চামচ ময়দা বা চালের গুঁড়ো, ২ চামচ ঘি। জল হাতের সামনে রাখবেন।

প্রণালী: কাঁচকলা ও আলুর খোসা ছুলে টুকরো করে নিয়ে একসঙ্গে প্রেশারে দু'-তিনটে সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নামিয়ে রাখতে হবে। ঠান্ডা হলে কাঁচকলার টুকরোগুলোর সঙ্গে একটা বড় আলু সেদ্ধ, সামান্য নুন, হলুদ, চিনি এবং প্রয়োজনমতো ময়দা বা চালের গুঁড়ো মিশিয়ে মেখে নিতে হবে। বাকি আলুগুলোকে ডুমো ডুমো করে কেটে রাখতে হবে। কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে তা গরম হলে ওই কাঁচকলা-আলু মাখাটা ছেড়ে দিতে হবে। সামান্য সাঁতলে একটা সমান বড় প্লেটে ছড়িয়ে দিতে হবে বৃত্তাকারে। একটু ঠান্ডা হলে বরফি আকারে কেটে নিতে হবে। এর পর কড়াইয়ে পরিমাণমতো তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে তেজপাতা ও কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে, আলুর টুকরোগুলো ছেড়ে তাতে সামান্য হলুদ, পরিমাণমতো নুন দিয়ে সামান্য ভাজতে হবে। তাতে ১ চামচ আদা বাটা, ১ চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চামচ ধনে গুঁড়ো, ৩টে লংকা, কয়েক টুকরো টম্যাটো দিয়ে ভালমতো সাঁতলাতে হবে। এর পর ৪ টেবিল চামচ দই একটা পাত্রে নিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে কড়াইয়ে ঢেলে দিতে হবে। একটু ফুটে উঠলে পরিমাণমতো জল দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। ঝোল ভালমতো ফুটে উঠলে কাঁচকলার বরফিগুলো কড়াইয়ে ছেড়ে দিয়ে সামান্য চিনি দিতে হবে। ২/৩ মিনিট পর ঘি এবং গরম মশলা দিয়ে নাড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে। যাঁরা একেবারেই মাছ-মাংস খান না, তাঁরা গরম ভাতে কাঁচকলার কোপ্তা খেয়ে দেখুন। খাওয়ার পর নিশ্চয়ই বলবেন— বাহ্, দারুণ খেলাম।

দু'বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দীপ্তির চিন্তা এখন চিন যাত্রা !

শ্রীমতী ডুয়ার্স

শিলিগুড়ি জংশন বি.আর.আই. কলোনির অ্যাথলিট দীপ্তি পাল ছোট থেকেই দৌড়ে চলেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে তাঁর দৌড় শুরু। আজ ৫২ বছর বয়সেও চলছে তার দৌড়। এর মধ্যে দু'-দুবার জাতীয় স্তরে সোনা জিতেছেন। রাজ্য স্তরের দৌড়ে কত যে সোনা জিতেছেন তার হিসেব নেই। তবে তাঁর হিসাবে, ছোট থেকে দৌড় চালিয়ে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে একশোর ওপর শংসাপত্র পেয়েছেন, আর কাপ জিতেছেন সাড়ে সাতশ। মেডেল পেয়েছেন তিনশোর কিছু বেশি। এবারে চিনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় যেতে চান। কিন্তু আর্থিক সমস্যা তাঁকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। তিনি কীভাবে চিনের প্রতিযোগিতায় যাবেন সে চিন্তা করে চলেছেন।

গত ২ মার্চ মহীশুরে অনুষ্ঠিত ৮০০ মিটারের জাতীয় দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে সোনা জিতে আসেন দীপ্তি পাল। আবার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় দৌড় প্রতিযোগিতাতে যোগ দিয়েও সোনা জিতে আসেন দীপ্তিদেবী। শিলিগুড়ি জংশনে তাঁর ভাঙা ঘর। বেড়া দেওয়া ঘরে টিন ফুটো। তা দিয়ে বর্ষাকালে জল পড়ে। কিন্তু ঘর ভরতি মেডেল, শংসাপত্র আর কাপ। একটা সময় সংসার প্রতিপালন করতে ফেরিওয়ালার ভূমিকায় এদিক ওদিকে ঘুরেছেন। তবুও দৌড়ের অনুশীলন ছাড়েননি। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দৌড় অনুশীলন করেন। আবার বিকেল হলেই মাঠে ছুটে যান। শুধু দৌড় আর দৌড়। কোনও ক্লান্তি নেই। প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'এমনিতে জীবনের প্রতিযোগিতায় সবাই দৌড়ে চলেছেন। কেউ হারতে রাজি নন। তবে জীবনের ইঁদুর দৌড়ের সঙ্গে বাস্তবিক দৌড় অনুশীলন সকলের দরকার। কারণ, দৌড় অনুশীলন করলে শরীর ভাল থাকে'।

শিলিগুড়ি জংশনে তার বেড়ার ঘরে বহু মেডেল সাজানো রয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও তার বাড়িতে গিয়েছেন। তাকে পুরসভা পৃথকভাবে সংবর্ধনা দিয়েছে শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে, শিলিগুড়ির সমাজসেবী তৃণমূল নেতা মদন ভট্টাচার্য তাকে মহীশুরে যাওয়ার সময় ট্রেন ভাড়া বাবদ অর্থ সাহায্য করেন। ভবিষ্যতে আরও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মদনবাবু। শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ পৌষমেলা কমিটি কিছুদিন আগে তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। পৌষ মেলা কমিটির তরফে সমাজসেবিকা জ্যোৎস্না আগরওয়াল তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সংবর্ধনা পেলেও আর্থিক সমস্যা তাকে চিন্তায় রেখেছে। তার স্বপ্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার নিয়ে আসা। তার জন্য গত বছরই তিনি অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু পারেননি। এবারে চিনের আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা শুরু করেছেন। কিন্তু পারবেন কিনা, সে চিন্তা তার মনে দেখা দিয়েছে। তার কথায়, 'চিন যেতে গেলে অনেক টাকার দরকার। কী করে টাকা যোগাড় হবে, বুঝতে পারছি না'। সেই কারণে, তিনি চাইছেন একটি চাকরি। সরকারি-বেসরকারি একটা চাকরি পেলে তার লড়াই অনেক সহজ হয় বলেও তিনি জানাচ্ছেন।

বাপি ঘোষ

কোমর ও হাঁটু সচল রাখাটা জরুরি

ঠিক কথা। কিন্তু রাখবেন কী করে? সারাদিন হয় দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ। রান্নাবান্না? দাঁড়িয়ে, বাসন মাজা? দাঁড়িয়ে। ঘর বাথরুম সাফাই দোকান-বাজার কিংবা অফিস? স্কুটি বা বাইকে। ফলত সিঁড়ি ভাঙতে বেশ কষ্ট, উবু হয়ে কিছু করতে গেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত, এমন কী রিকশায় উঠতেও কসরৎ করতে হয়। চল্লিশ পেরোতেই ঘাড়-হাঁটু, কোমর একে একে জানান দিতে থাকে, অনেক হয়েছে এবার বদলে ফেল শরীরের যন্ত্রাংশ। কিংবা অন্তত কিছু একটা দিয়ে আপাতত ঠেকনা দাও।

অথচ শরীর ঠিক রাখতে গেলে যে জিমে যেতে হবে বা ভোরবেলা উঠে হাঁটতে হবে সে সবের কোনও মানে নেই! তাহলে কি যোগব্যায়ামের ক্লাসে ভরতিহতে হবে? সবার পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। আশপাশের দু'-চারজন সঙ্গী যোগাড় করতে পারবেন? তারও সুযোগ নেই? বেশ, তাহলে একটা কাজ রোজ অন্তত নিজের জন্য করুন। সারা দিনে কোনও একটা সময় মিনিট কুড়ি বা আধ ঘন্টা বের করে ফেলুন। পরিবারের সবার সামনে সংকোচ থাকলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন। মেঝেতে একাট আসন পেতে ফেলুন। পাশের ছবিটা দেখুন মন দিয়ে।

১

তারপর শুয়ে বসে একটার পর একটা ব্যায়াম সারুন। ধীরে ধীরে। প্রত্যেকটা দশবার করে করুন।

ব্যায়াম ১: চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দু'পাশে, চোখ সোজা সিলিং-এ। এবার আস্তে আস্তে দু' পা জোড়া করে তুলুন। ছবির মতো ক্লকওয়াইজ ঘোরান দশবার। পনের সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দশবার।

ব্যায়াম ২: পায়ের নিচে ছোট টুল রাখুন। দু'হাত সোজা রেখে ঘাড় তুলে ধীরে ধীরে যতটা ওঠা সম্ভব উঠুন। এক দুই তিন চার পাঁচ গুণে ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থায় আসুন। এভাবে দশবার।

২

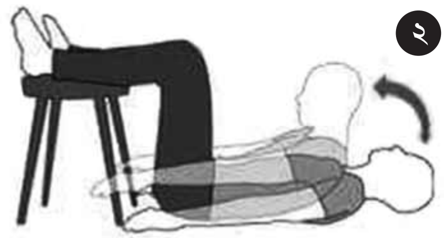

ব্যায়াম ৩: এবার টুল সরিয়ে পা ভাঁজ করে একই ভাবে দশবার।

৩

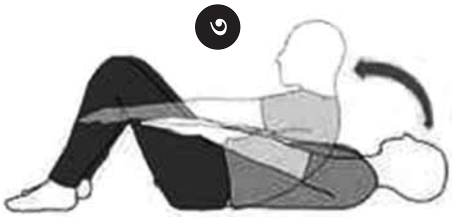

ব্যায়াম ৪: একই অবস্থানে ডান পা দশবার তারপর বাঁ পা দশবার ছবির মতো ভাঁজ করুন।

৪

৫

ব্যায়াম ৫: এবার হাত দুটো ভাঁজ করে মাথার নিচে রাখুন। সেই অবস্থায় ঘাড় তোলার চেষ্টা করুন। এক থেকে পাঁচ গোনার পর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনুন।

৬

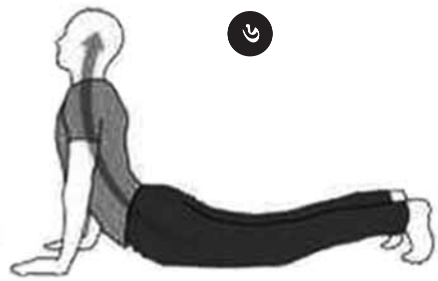

ব্যায়াম ৬: উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'হাতের ওপর ভর করে মাথা সোজা রেখে, কোমরের অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে শরীরের উর্দ্ধাংশকে যতটা সম্ভব সোজা করার চেষ্টা করুন। এক থেকে পাঁচ গুণে আবার প্রথম অবস্থায় চলে আসুন। এভাবে দশবার।

৭

ব্যায়াম ৭: হাত দুটোকে দু'দিকে ১৮০ ডিগ্রিতে ছড়িয়ে রাখুন। পা দুটো জোড়া করে ভাঁজ করে পেটের কাছে নিয়ে আসুন। এবার পা দুটো ভাঁজ অবস্থাতেই একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে ঘোরান, সেই সঙ্গে মাথাও। এভাবে দশবার।

৮

ব্যায়াম ৮: অনেকটা বুক ডনের মতো। দু'হাতের কনুই অবধি মাটিতে শোয়ানো থাকবে। তার ওপর ভর করে গোটা শরীরকে সোজা রেখে তুলতে হবে। সেই অবস্থায় এক থেকে পাঁচ গুনে ফের প্রথম অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। এভাবে দশবার।

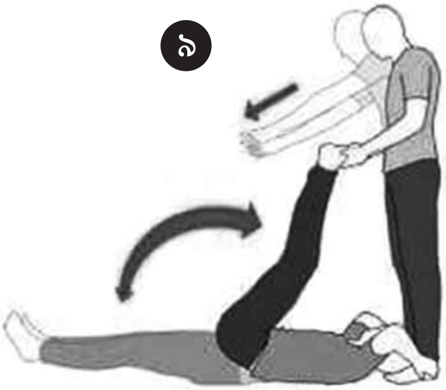

ব্যায়াম ৯: আরেক জনের সাহায্য দরকার। প্রথম আটটি ঠিকঠাক রপ্ত করার পরই এটি করা ভাল।

ব্যায়ম করার সময় যেগুলি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে

ক) বদ্ধ ঘরে ব্যায়ম ঠিক নয়। দরজা বন্ধ রাখতে হলেও জানালা দিয়ে হাওয়া বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখবেন। ফ্যান বা এসি চালিয়ে ব্যায়াম হয় না, ঘাম ঝরানোই আসল উদ্দেশ্য।

খ) একদম খালি পেটে বা একদম ভরা পেটে ব্যায়াম নয়। তেমনই ব্যায়ামের মাঝে বা পরেই ঢকঢক করে ঠান্ডা জল বা পানীয়/ খাবার খাওয়া ঠিক নয়।

গ) এই কয়েকটি ব্যায়াম ছাড়াও দিনে কোথাও আসা যাওয়া মিলিয়ে অন্তত দু' কিলোমিটার হাঁটুন।

ঘ) মাংস, মদ, রেস্টুরেন্ট বা নেমন্তন্ন বাড়ির খাবার সপ্তাহে একদিনের বেশি কখনই নয়। যেদিন খাবেন পরদিন ব্যায়ামের ছুটি যেন না হয়।

ঙ) স্কুটি বা মোটরসাইকেল ব্যবহার করলে নিয়ম করে মাঝেমধ্যে বাই সাইকেল চালান। সঙ্গী জোগাড় করে ছুটির দিন ফাঁকা রাস্তা ধরে ঘুরে আসুন অনেকটা দুর। সেদিন মোটরবাইক/স্কুটি বিশ্রাম নিক।

এই কয়েকটি উপদেশ নিয়ম করে চার সপ্তাহ করে দেখুন। তারপর মেইল করে জানান শ্রীমতী ডুয়ার্স-এ। আগের চাইতে কতটা বেশি ফিট থাকবেন তা না হয় নিজেই বলবেন!

মৃন্ময়ী মহাপাত্র

ফিচেল ডুয়ার্স

নম্বর একই থাকে কোম্পানি পাল্টে যায়

রাজনীতির দল বদল আজ আর নতুন কিছু নয়, খবরের কাগজে রোজ বেরোয়, আর আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয় না। তবু সম্প্রতি ডুয়ার্সের এক বড় নেতা জার্সি বদলালেন, যা এখানকার লোকের কাছে অবাক করার মতোই ঘটনা। সাংবাদিকরাও অবাক, ঘিরে ধরে প্রশ্ন করলেন নেতাকে— দাদা, এ কী করে সম্ভব হল? এতো একেবারে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু! আমরা তো ভাবতেই পারছি না! নেতা উত্তর দেওয়ার আগেই ফড়ে পাশ থেকে বলে উঠল— কেন? এত অবাক হওয়ার কী আছে? আজকাল মোবাইলে দেখেন না, নাম্বার একই থাকে, কোম্পানি পালটে যায়! আগে ভাবতে পারতেন এরকম? হুঁ হুঁ দাদা আজকাল সব এই নিয়মেই হয়!

*

অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়িতে তার ছোট্ট ভাইঝি একটা ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞেস করেছিল, দুই বন্ধু অমল আর বিমল বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। একটা বাস এল, বিমল উঠল কিন্তু অমল উঠল না। বল তো কেন? অনেকক্ষণ মাথা চুলকে উত্তর খুঁজছি তখন শিশুটি বলে উঠল, খুব সোজা, বাসের গায়ে বড় করে লেখা ছিল 'ওনলি বিমল'। আর সেদিন আমার নিজের ১৫ বছরের ফেসবুক প্রেমী ভাইপো আবার ধাঁধায় ফেলল— বলত বন্ধু আর বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে ফারাক কোথায়? কোথায়? আমি হাঁ করে জিজ্ঞেস করি। ভাইপো হেসে বলল, ধরো তুমি বাইক চালাচ্ছ বেশ জোরে। পেছলে তোমার 'বন্ধু' থাকলে বলবে ভাই গাড়িটা আস্তে চালা। আর সেখানে 'বেস্ট ফ্রেন্ড' থাকলে বলবে, আরেকটু জোরা চালা বাবু, সামনের গাড়িটায় একটা দুর্দান্ত দেখতে মেয়ে আছে।

*

আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত গ্রামের এক স্কুলে মাস্টারমশাই প্রচণ্ড রেগে ছাত্রকে বেতাচ্ছেন। আর ছাত্র বলছে, আমি অন্যায় কী করেছি বলুন না স্যার? উফ্, লাগছে স্যার। হেড স্যার দৌড়ে এলেন, আহা করছেন কী! এত মারবেন না। ওর বাবা এবার পঞ্চায়েতে নালিশ করে দেবে। মাস্টারমশাইয়ের রাগ কমেনি, আর বলেন কেন, বইপত্রের ধার দিয়েও তো যায় না এরা। জিজ্ঞেস করলাম, মশা নোংরা জলে ডিম পাড়ে কেন? উত্তরে ফাজিলটা কী বলেছে জানেন, স্যার পরিষ্কার জলে ডিম পাড়লে মানুষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাই!

হরিশচন্দ্র রায়

যে কেউ পাঠাতে পারেন। মেইলে srimati.dooars@gmail.com ডাক যোগে **শ্রীমতী ডুয়ার্স। আড্ডাঘর। মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১।** বা হাতে।

তর্ক চলুক

সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে ডাক্তারবাবু প্রাইভেট চেম্বারে গেলে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মেলে কি?

এ নিয়ে আপনার মত ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠান। মেইল করুন srimati.dooars@gmail.com কিংবা ইনল্যান্ড/খামে ডাকযোগে পাঠান। হাতে হাতেও জমা করতে পারেন।

শেষ তারিখ ১০ জুন ২০১৭।

শ্রীমতী ডুয়ার্স

আড্ডাঘর। মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

সেরা মতামতের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

মালবাজারে শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের যাত্রা হল শুরু

নিজলয় হোমে শ্রীমতীরা

আমরা শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের সদস্যরা একদিকে যেমন দৈনন্দিন কাজের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জন্য এক টুকরো আনন্দের সময় বের করে নিই তেমনই নানান সামাজিক কাজকম্মের কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে করে। মনে হয় কিছুটা হলেও সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে আমাদের। এই ইচ্ছে থেকেই এবারে মনে হল, আমরাও তো মা, তাই মা-হারা শিশুদের সঙ্গে একটা দিন অন্তত যদি মাতৃত্বের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায় তাহলে ওদের হাসি মুখগুলো কিন্তু সারাজীবন সুখানুভূতিতে ভরিয়ে রাখবে আমাদের। ছক কষা হল প্রয়োজনানুযায়ী। একটি ছুটির দিন দেখে ছোট্ট ছোট্ট উপহার হাতে নিয়ে আমরা শ্রীমতীরা পৌঁছে গেলাম জলপাইগুড়ির একপ্রান্তে ‘নিজলয় হোম’-এ। জনা বিশেক ‘আন্টি’কে দেখে ফুলের মতো মেয়েদের মুখে হাসি আর ধরে না। সুপারিন্টেনডেন্ট জানালেন, ‘কেউ এলে ওরা এরকমই খুব খুশি হয়’। বুঝলাম, মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের তৃপ্তি পায় ওরা। নিজেদের সন্তানের মুখগুলো ফুটে উঠছিল মনের মধ্যে। সামান্য হলেও ওদের পছন্দের উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

লেখাপড়ার কথা সবাই বলে, ভাল ভবিষ্যৎ গড়ার কথা সবাই বলে, কত কত জ্ঞানের কথা... তার কী শেষ আছে! কিন্তু রঙিন ক্লিপ, রঙিন হেয়ার ব্যান্ড আর মিষ্টি নিয়ে যাওয়া আন্টিদের উপহার পেয়ে ওরা যে সত্যিই কত মজা পেয়েছে তা বেশ বুঝতে পারলাম ওদের কাড়াকাড়ি দেখে। মিষ্টি করে হেসে হেসে আমাদের সঙ্গে কথা বলল ওরা। একে একে স্নান করছিল সকলে, দুপুর বারোটা বেজে গিয়েছিল তখন। ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম ওদের সঙ্গে, সুপারের সঙ্গে। যত দেখছি, একের পর এক যেন কাহিনি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। একেকটি মেয়ের জীবনচরিত একেকটি আখ্যান। কিচ্ছু নেই তাতে, শুধু কতগুলো কষ্টের পিণ্ড। মেয়ে জন্মের প্রায়শ্চিত্ত। প্রতিশ্রুতি দিলাম হোম কর্তৃপক্ষকে, যে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলবেন, শ্রীমতী ডুয়ার্স পাশে থাকবে আপনাদের।

নিজলয় হোমের সুপারিন্টেনডেন্ট

হোম থেকে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। এক অনাবিল আনন্দের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে। নিজেরা যাতে আরও বড় কোনও কাজের দায়িত্ব নিতে পারি তারই প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম নিজেরাই। সিন্ধুতে বিন্দুর প্রয়োজনও আছে বৈকি।

রিংকু বসু চৌধুরী

নেতাজির স্মৃতিজড়িত হারমোনিয়াম সুশ্বেতার সবচেয়ে বড় সম্পদ

শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার পুরনো বাসিন্দা ষাট বছর বয়স্ক সুশ্বেতা বসুর একটি বিরাট ফ্ল্যাট রয়েছে। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটের থেকেও তাঁর কাছে বড় সম্পত্তি হল, একটি হারমোনিয়াম। কিন্তু কেন এই হারমোনিয়াম তাঁর কাছে বড় সম্পত্তি হল, তাঁর কথায়, 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯২২-২৩ সালে শিলিগুড়িতে একবার এসেছিলেন বন্যার সময়। বন্যার সময় ত্রাণ নিয়ে একটি বিরাট ট্রেন এসেছিল শিলিগুড়িতে। আর সেই ট্রেনে ছিল সেই হারমোনিয়াম। নেতাজির পরিচালনায় আসা রিলিফ ট্রেন থেকে আমার দাদু স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ দত্ত মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে এই হারমোনিয়ামটি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই হারমোনিয়াম আমার গান শেখার প্রধান বিষয়ই হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তীতে।'

এই সেই হারমোনিয়াম

শিলিগুড়ির আদি বাসিন্দা ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ দত্ত। তখন শিলিগুড়ি আজকের শিলিগুড়ি হয়নি। তখন শিলিগুড়ি ছিল বনজঙ্গল আর বৃষ্টির শহর। আর সেই সময়ই একবার খুব বন্যা হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ বলেন, ১৯২২-২৩ সালে বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়েছিল। আর তখন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটিতে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নির্দেশে ত্রাণ পাঠানো হয়েছিল। শিলিগুড়িতেও সেই সময় আসে একটি রিলিফ ট্রেন। আর সেই রিলিফ ট্রেনের পরিচালনায় ছিলেন খোদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।' সুশ্বেতাদেবী বলেন, বন্যার জন্য ত্রাণ নিয়ে আসা রিলিফ ট্রেনটিতে হঠাৎ একটি হারমোনিয়াম নজরে গিয়ে পড়ে আমার দাদুর। রিলিফের দায়িত্বে ছিলেন খোদ নেতাজি। দাদুর কাছে শোনা গল্প থেকে বলছি, সেই রিলিফ ট্রেনে হারমোনিয়ামটি বেশ পছন্দ হয়ে যায় আমার দাদুর। তিনি তখন ট্রেনের সঙ্গে আসা লোকজনদের কাছে মাত্র পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে সংগ্রহ করেন

> ১৯২২-২৩ সালে শিলিগুড়ির বন্যা হয়েছিল। শিলিগুড়িতেও সেই সময় আসে একটি রিলিফ ট্রেন। আর সেই রিলিফ ট্রেনের পরিচালনায় ছিলেন খোদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

হারমোনিয়ামটি। সেই থেকে নেতাজি স্মৃতি বিজড়িত হারমোনিয়াম দিয়ে চলছে আমার সংগীত চর্চা।'

সুশ্বেতাদেবীর মা ঊষারানি গুহ সেই হারমোনিয়ামে একসময় ক্ল্যাসিকাল গান শিখতেন। আর সুশ্বেতাদেবীর গানের হাতেখড়ি হয় এই হারমোনিয়ামেই। ডাবল রিডের হারমোনিয়ামটি সুশ্বেতাদেবী একবার সংস্কার করেছেন। তাতে তিনি নেতাজির একটি ছবিও সেঁটে রেখেছেন শ্রদ্ধাস্বরূপ। তিনি হারমোনিয়াম কখনও কারও কাছে বিক্রি করতে চান না। অনেকে অনেকবার নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত হারমোনিয়াম বলে সেটি কিনতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি তা বিক্রি করেননি। তিনি বলেন, 'এটি আমার ফ্ল্যাটের চেয়েও বেশি মূল্যবান। কিছুদিন আগে নেতাজি জন্মজয়ন্তীর দিনে আমি এই হারমোনিয়ামে দেশাত্মবোধক গান করেছি'। সুশ্বেতাদেবী নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শিলিগুড়ি শাখার কোষাধ্যক্ষ। তিনি আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির সদস্যা। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ বন পরিবেশ জীবনবিকাশ ফোরামের সহসভাপতি। তিনি বলেন, 'বাংলা সংস্কৃতির বহু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মণীষি ও দেশ প্রেমিকরা আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বিশষয়। এই হারমোনিয়ামে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার সংগীত চর্চা করার সময় নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এই হারমোনিয়ামেই আমি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে রবি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাই।'

শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করতে চান শিল্পী পালিত। তিনি বলেন, 'এই হারমোনিয়ামটি আমি শুনেছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি একবার সুশ্বেতাদির সঙ্গে এই হারমোনিয়ামে দেশাত্মবোধের উপর গান গেয়েছি। বেশ ভাল লেগেছে। আমাদের জীবন থেকে বহু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলা সংস্কৃতির বহু সম্পদ লুপ্তপ্রায়, হারিয়ে যাচ্ছে। এখন এ সবই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে'।

বাপি ঘোষ

অরণ্য মিত্র

পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌বোধন হল বুদ্ধ ব্যানার্জির ড্রিম টিম ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর। কিন্তু সে দলে দাসবাবু, সুরেশ কুমার আর রঞ্জিত— তিনজনই কি কাঙ্ক্ষিত ছিল? পল অধিকারী কোথায় বিস্ফোরণ ঘটালেন? ফালাকাটার যুব নেতা খুনের পর শুক্লা দাসকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কনক দত্তর অনুমান দেখা গেল কাজ করছে। তার বিষয়ে এবার পাওয়া গেল পাকা খবর। অন্য দিকে নবীন রাই আবার বেরিয়ে এসেছেন তাঁর ঘেরাটোপ থেকে। শিলিগুড়ির ইউনিটকে চাঙ্গা করার কাজে লেগে পড়েছেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে যে, ব্ল্যাক বেঙ্গল-এ যোগ না দিয়েও কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসী। তারপর?

৯৪

নবেন্দু মল্লিক হত্যাকাণ্ডের দু'দিন কেটেছে। মিডিয়ায় জোর হইচই হচ্ছে ঘটনাটা নিয়ে। কাগজে, টিভিতে প্রয়াত যুব নেতার ছবি দেখা যাচ্ছে এখনও। বিরোধীরাও এমন একটা হত্যাকাণ্ডের সংবাদে বিচলিত। মোটামুটি সব পক্ষই মেনে নিয়েছে যে, এটা সম্ভবত কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর কাজ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ এই হত্যার দায় স্বীকার না করায় বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে। কনক দত্তর পরামর্শ মেনে পরি ঘোষাল লোক লাগিয়েছেন। তারপর উত্তেজিতভাবে সময় কাটাচ্ছেন। যে কোনও মুহূর্তে খবর আসতে পারে। ড্রাইভার অবশ্য বলেছে যে, নবেন্দু মল্লিক জলপাইগুড়ি শহরের ঠিক কোথায় যাচ্ছিলেন, সেটা তার অজানা। বাবু টাউনে এসে একটা জায়গায় গাড়ি রেখে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে চলে যেতেন। গত দু'সপ্তাহে কয়েকবার এসেছিলেন জলপাইগুড়ি। প্রত্যেকবার গাড়ি রেখে টোটো চেপে চলে যেতেন। তার আগে কী হত, সেটা তার অজানা। কারণ সে মোটে কুড়ি দিন হল বাবুর ড্রাইভার হিসেবে জয়েন করেছে।

অর্থাৎ, শুক্লা দাসের কোনও সন্ধান পুলিশের পাওয়ার কথা নয়। কনক দত্ত অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, নবেন্দু মল্লিকের সঙ্গে শুক্লা দাসের যোগাযোগের বিষয়টি পুলিশের আদৌ জানা নেই। সম্ভবত শুক্লা দাসকে নিরাপদে রাখার জন্য খুনটা করানো হয়েছে। 'আমি নিশ্চিত যে সে এখনও জলপাইগুড়ি ছাড়েনি।' বেশ জোর দিয়ে কথাটা পরি ঘোষালকে বলেছেন কনক দত্ত, 'আপনার লোক যদি ঠিকমতো খোঁজ লাগায়, তবে নবেন্দু মল্লিক গত দু'সপ্তাহে আপনার শহরে গাড়ি রেখে কোথায় কোথায় গিয়েছে, তার একটা সূত্র ঠিক খুঁজে পাবে।'

'সেটা তো তদন্ত করলে পুলিশও পেতে পারে।' পরি ঘোষাল বলেছিলেন, 'সে ক্ষেত্রে জলপাইগুড়িটা শুক্লা দাসের পক্ষে বেশ রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না?'

'পুলিশ অলরেডি ভুল পথে চলছে ঘোষালবাবু! তারা তিনজন প্রাক্তন কেএলও-কে গ্রেপ্তার করে জেরা করছে।'

কনক দত্তর কথাটা মেনে নিয়েছিলেন পরি ঘোষাল। কাজের জন্য রীতিমতো তুখড় এক চরকে এবার মাঠে নামিয়েছেন তিনি। লোকটা শহরের অলিগলি, পাকস্থলীর খবর জানে। সে বলেছে যে, নবেন্দু মল্লিক নামের লোকটা যদি সত্যিই শহরের কোনও ফ্ল্যাটবাড়িতে এর মধ্যে দু'-তিনবার গিয়ে থাকে, তবে সে খবর সে বার করবেই। নচেৎ টাকা ফেরত দেবে।

তাই মনের উত্তেজনা চেপে রেখে অস্থিরচিত্তে সময় কাটাচ্ছিলেন গত দু'দিন। খবর যে কোনও সময় আসতে পারে।

খবরটা সত্যিই এল, রাত আটটা নাগাদ। আকাশে তখন ধুন্ধুমার কালবৈশাখীর শেষে মেঘের ফাঁক দিয়ে সদ্য চাঁদ বেরিয়েছে। পরি ঘোষাল ভেবেছিলেন, উত্তেজনা প্রশমনের জন্য হাঁটতে বার হবেন। তাই ঝড় থামার অপেক্ষায় ছিলেন। ঝড়ের সঙ্গে জোর এক পশলা বৃষ্টিও হল। সেটা থামার পর তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য পোশাক বদলাবার কথা ভাবতেই ফোন এল গুপ্তচরের।

'পেয়ে গিয়েছি দাদা!'

চরের প্রথম কথাটা ফোন বেয়ে কানে আসতেই পরি ঘোষাল লাফিয়ে উঠলেন। মোবাইলটা এক

কান থেকে আরেক কানে লাগিয়ে বললেন, 'নবেন্দু মল্লিক কোথায় যেত, সেটা জানতে পেরেছ?'

'শুধু জানতে পারিনি দাদা, দেখেও এসেছি ফ্ল্যাটবাড়িটা। আপনার পাড়া থেকে কাছেই। গোপীনাথ ডাক্তারের বাড়িটা ভেঙে যে ফ্ল্যাটবাড়িটা হয়েছে, সেখানে তিনি আসতেন। তবে কোন ফ্লোরে তা এখনও জানতে পারিনি।'

'সিকিয়োরিটি আছে?'

'না। ফ্ল্যাটের মালিকরা বেশির ভাগই সেখানে থাকেন না। নীচতলায় ছোট একটা দোকান আছে। দোকানের ছেলেটার থেকে খবর মিলেছে। মল্লিক সেই দোকান থেকে সিগারেট কিনে ভিতরে ঢুকত। তাই ছবি দেখেই চিনতে পেরেছে।'

'তুমি ভিতরে ঢুকেছিলে?'

'ঢুকেছিলাম। সব মিলিয়ে ছাব্বিশটা ফ্ল্যাট। চোদ্দোটা তালাবন্ধ। বাকি বারোটা ফ্ল্যাটের কোনটায় সে আসত— এটা জানতে পারিনি। তবে শুক্লা দাসের ছবি দোকানের ছেলেটাকে দেখিয়েছিলাম। সে চিনতে পারেনি।'

'কড়া নজর রাখো ফ্ল্যাটবাড়িটায়।' ঘরময় অস্থির পায়ে পায়চারি করতে করতে বললেন পরি ঘোষাল, 'শুক্লা দাস ওই বারোটা ফ্ল্যাটের কোনও একটায় আছে। থাকতেই হবে। সে যদি ফ্ল্যাট থেকে না বার হয়, তবে কেউ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দরকারে চব্বিশ ঘণ্টা লোক বসিয়ে রাখো!'

গুপ্তচরকে নির্দেশ দিয়ে পরি ঘোষাল ফোন করলেন কনক দত্তকে। পাখি এবার ধরা পড়ার পথে। পুলিশ হলে এখনই তল্লাশি চালিয়ে বারোটা ফ্ল্যাটের কোনও একটা থেকে বার করে আনতে পারত শুক্লা দাসকে। কিন্তু পুলিশ এখানে ব্রাত্য।

৯৫

কয়েক মাস পর নবীন রাই সমতলে নামলেন। শিলিগুড়ি এখন হালকা মেঘে ঢাকা। রোদ্দুরের তেজ গায়ে না লাগলেও বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গরম। নবীন রাই কুলকুল করে ঘামছিলেন। ক্যাভেন্ডিসের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর নবীন রাই বুঝতে পেরেছেন যে, আপাতত তাঁর উপর আক্রমণের কোনও সম্ভাবনা নেই। বুদ্ধ ব্যানার্জি ছকটা ভালই ভেবেছিলেন। তাঁর উপর দু'-দু'বার হামলা করলেও ব্যানার্জির মূল লক্ষ্য ছিল দিল্লি এক্স-কে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হলে তিনি যে মরে যেতেন, সেটাও ভুলছেন না নবীন। তবে ব্যানার্জির উপর রাগ করে থাকার কোনও অর্থ নেই। ক্যাভেন্ডিসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ব্যানার্জির সঙ্গে টক্কর নেওয়াটা বোকামো হবে। ক্যাভেন্ডিস অবশ্য সেটা স্বীকার করেছেন। বুদ্ধ ব্যানার্জিকে একটা জবাব দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে সে ব্যাপারে বিরত থাকতে বলেছে দিল্লির কর্তারা।

মারিজুয়ানা নিয়েও খুব একটা আগ্রহ বোধ করছিলেন না নবীন রাই। ক্যাভেন্ডিস সে ব্যাপারে গতকাল মণিপুর রওনা দিয়েছেন। চরসের বাজারে ম্যানিলা ক্রিমের বিকল্প কিছু একটা নামাতে চাইছেন তিনি। তাঁকে বাগডোগরা বন্দরে আগরতলার বিমানে তুলে দিয়ে এসে নবীন রাই শিলিগুড়িতে নিজের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছিলেন জংশন স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে। মুনমুন টোপ্পো যে শিলিগুড়িতেই আছে, সেটা ক্যাভেন্ডিস নিশ্চিতভাবে তাঁকে জানিয়েছেন। তিনি কী কারণে মুনমুন টোপ্পোকে চিনলেন, সেটা অবশ্য বলেননি। লোকজন লাগিয়ে মুনমুনের ডেরাটা খুঁজে বার করতে চাইছেন নবীন রাই।

মুনমুনের সঙ্গে একবারই আলাপ হয়েছিল নবীন রাইয়ের। বিজু প্রসাদ পরিচয় করিয়েছিল। মুনমুন তখন পাঁপড় ব্যবসায়ীর রক্ষিতা। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে চা-বাগানের আদিবাসী মেয়েদের নীল ছবি আর দেহব্যবসার জগতে নিয়ে আসার কথা ভাবছিল তখন মুনমুন। ডুয়ার্সে নীল ছবিতে পা রাখার জন্য নবীন রাই হলেন সেরা মাধ্যম। অবশ্য আলাপ হলেও তখন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাননি নবীন রাই। কার্যকারণে মুনমুনের মুখটা মনে ছিল মাত্র। কিন্তু বিজু প্রসাদের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই মুনমুন টোপ্পোর সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবে আসছিলেন তিনি।

তাঁদের অন্ধকার জগতে দু'-পাঁচটা বিজু প্রসাদের মৃত্যুসংবাদ ভাবার মতো কোনও ঘটনাই নয়। তবুও বিজুর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল নবীনের। তাঁর নীল ছবির ব্যবসায় বিজুর অনেক অবদান আছে। নবীনকে সে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিল। নীল ছবি বানিয়ে ফেলা সোজা, কিন্তু বাজারে বিক্রি হওয়ার মতো ভিডিয়ো তৈরি করা অত সহজ কাজ নয়। উজ্জ্বল সাদা ডিজিটাল আলোয় উদ্ভাসিত কক্ষে চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা টেকনিশিয়ানদের মধ্যে সংগম করার সময় অধিকাংশ নতুন মেয়ে রোবটের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে অঙ্গসঞ্চালন করে। ক্যামেরার সামনে অর্গাজম হয় না। কিন্তু বিলেতের পর্নস্টাররা যেভাবে অভিনয় করে তা অস্কার পাওয়ার যোগ্য। সেসব দেখিয়ে মেয়েদের তালিম দেওয়ার জন্য প্রোডাকশন বানাতে সময় লাগত নবীন রাইয়ের। খরচ বেড়ে যেত। কিন্তু বিজু প্রসাদ সেসব মেনে নিয়েছিলেন। বুদ্ধ ব্যানার্জির নতুন দল একেবারে হিসেব করে সেসব মেয়েকে তুলে নিয়েছে।

আরও একজনের কথা মনে পড়ছে নবীন রাইয়ের। বাঙালি সেই মেয়েটার নাম মনামি। সে নিশ্চয়ই সুষমার সঙ্গেই আছে এবং বুদ্ধ ব্যানার্জির ব্ল্যাক বেঙ্গল টিমে ভিড়ে গিয়েছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা মোটেই ভাবছিলেন না তিনি। ব্ল্যাক বেঙ্গলকে চটানোর অর্থ তাঁর নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আবার তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হবে কাঠমান্ডুতে। ক্যাভেন্ডিসের কাছে সবকিছু বুঝে ওঠার পর প্রথমে নবীন রাইয়ের মনে হয়েছিল, প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু সেই সাময়িক উত্তেজনা এখন সুদূর অতীত। এই মুহূর্তে নিজের টিমকে জাগিয়ে তোলাটাই হবে প্রথম কাজ। ফাটাপুকুরের কাছে গুলির ধমক খাওয়ার পর রতন বিশ্বকর্মা ঝিমিয়ে আছে। তাকে আবার ময়দানে নামাতে হবে। ইসলামপুরের সেই লোকটার নাম মনে পড়ছে না— ইদানীং সংস্কৃতিজগতে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নাম কিনেছে সেই লোকটা, তার কাছে বেশ কিছু খবর পাওয়া উচিত। সিরাজুলের সঙ্গেও যোগাযোগ করা দরকার। ব্যানার্জির লোকেরা তাকে দলে টানার চেষ্টা করবে ঠিকই, কিন্তু তাকে পালটা টোপ দেওয়া যেতেই পারে। এ দেশে আইএস জঙ্গিদের জায়গা বানিয়ে দেওয়াটাই সিরাজুলের মূল উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা যেতেই পারে।

'আমি এখনও মরে যাইনি।' ভাবতে ভাবতে আপন মনে বলে উঠলেন নবীন রাই।

৯৬

'দিল্লি এক্স বা দিল্লি হাই— এই দলটা থেকে বেরিয়ে নিজের দল খোলার ইচ্ছেটা আমার অনেক দিনের।'

সোফায় একটু হেলান দিয়ে বলতে শুরু করলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। বাংলোর মাঝারি মাপের ঘরটায় দাসবাবু, সুরেশ কুমার আর রঞ্জিত আলাদা দুটো সোফায় ভাগাভাগি করে বসেছেন। তাঁদের তিনজনেরই চোখ বুদ্ধ ব্যানার্জির মুখের উপর স্থির। আধ ঘণ্টা হল তিনি এসেছেন দীননাথ চৌহানের মালিকের এক্সক্লুসিভ বাংলোতে। অতি সাধারণ একটা গাড়িতে এসেছেন তিনি। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে তাঁকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন দাসবাবু নিজে। রিসর্ট এবং বাংলোর এই পরিবেশটা বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। ডুয়ার্সে ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর কোনও দপ্তর নেই। বুদ্ধ ব্যানার্জি ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন যে, এই বাংলোতে মাঝেমধ্যে দলের সভা বসাবেন।

'নিজের দল খোলার অর্থ দিল্লি হাই-এর বিরোধিতা করা।' জানলা দিয়ে বাইরে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'আমি জানতাম যে ওদের জানিয়ে নিজের দল খোলাটা অসম্ভব। তখন আমি

কন্যাসাথি নামে একটা এনজিও-র আড়ালে খেলতে শুরু করলাম ওদের সঙ্গে। ডুয়ার্সে দিল্লি হাই-এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে আমি কন্যাসাথির কাজ চালিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সে বিষয়ে কোনও তথ্য আমি ওদের জানাইনি। উলটে ডার্ক ক্যালকাটার নামে ওদের লোকজনের উপর হামলা শুরু করি। ওরা ডার্ক ক্যালকাটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তোমরাও বিশ্বাস করেছিলেন, তা-ই তো?'

'এখন বুঝতে পারছি যে আমরা কেন ডার্ক ক্যালকাটার কোনও হদিশ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।' দাসবাবু একটু হেসে বললেন, 'অথচ আমাদের গোপন খবরগুলো ওরা পেয়ে যাচ্ছিল।'

'তবে তোমরা সবাই ভাল কাজ করছিলে।' বুদ্ধ ব্যানার্জি প্রশংসার সুরে জানালেন, 'কন্যাসাথির কাজগুলো যে সামলাত, তার নাম শুক্লা দাস। খুব এফিশিয়েন্ট গার্ল। কিন্তু ওরা একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলে। কনক দত্ত নামে ধূপগুড়ির এক নাছোড়বান্দা এক্স-পুলিশম্যান ভুলটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ায় আমি সিদ্ধান্ত নিই, কন্যাসাথি তুলে দেব।'

'একটা এক্স-পুলিশম্যানকে সরিয়ে দিতে কি আমাদের খুব অসুবিধে হত?' সুরেশ কুমার মৃদু গলায় জানতে চাইলেন, 'ফালাকাটার নেতাটাকে যেভাবে সরিয়ে দিলেন, সেভাবে ওই পুলিশটাকেও সরানো যেত। আপনি একবার বললেই ওটাকে নামিয়ে দিতাম।'

'চাইলে আজ রাতেই কনক দত্ত খবর হয়ে যাবে সুরেশ!' বুদ্ধ ব্যানার্জি হাসতে হাসতে জানালেন, 'বাট আই লাইক হিম। তবে ফালাকাটার যুব নেতাটি বেঁচে থাকলে তার সূত্র ধরে সে শুক্লাকে খুঁজে বার করত। তাই ওকেই সরিয়ে দিলাম। সে শুক্লার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। প্রেম খুব খারাপ। আমাদের মেয়েরা প্রেম করে না। প্রেম আমাদের বিষয় নয়। অবশ্য আজ যাঁর জন্মদিন, তিনি প্রেমের কবি।'

বুদ্ধ ব্যানার্জি থামলেন। বাকি তিনজন চুপ করে রইল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গ্রেট পোয়েট, সেটা ওরা জানে। কিন্তু এর বেশি কিছু জানে না। টেগোরের জন্মদিনটাকে কেন ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নিয়েছেন বুদ্ধ ব্যানার্জি, সে বিষয়েও কোনও আগ্রহ নেই ওদের। তবে আজ সন্ধে ঠিক ছ'টায় ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে ডুয়ার্সের কোথাও বোমা বিস্ফোরণ হবে। সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পল অধিকারীকে। সরকারি খাতায় মৃত এই কেএলও জঙ্গিও আবার ময়দানে নামছে আজকের বিস্ফোরণের মাধ্যমে।

'কিন্তু একটা কথা কি কখনও ভেবেছ তোমরা?' তিনজনের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্নটা করলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি, 'আমি তো তোমাদের তিনজনের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সে নিয়েই ব্যস্ত ছিলে তোমরা। তাহলে ডুয়ার্সে ছড়িয়ে থাকা দিল্লি এক্স-এর লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার কাজটা কে করল?'

'এটা আমি অনেকবার ভেবেছি।' দাসবাবুর গলা শোনা গেল, 'কিন্তু কে করছে, সেটা জানতে পারিনি। বাট কেউ তো করছিল। আমি প্রথমে ভাবতাম রঞ্জিত করছে। কিন্তু ওকে মিট করার পর বুঝেছিলাম যে ও কোনও কোঅর্ডিনেশন করছে না।'

'আসলে আমি ডার্ক ক্যালকাটার সোর্স খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আই ফাউন্ড মেনি থিংস রং।' একটু ইতস্তত করে বললেন রঞ্জিত। বুদ্ধ ব্যানার্জি তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'ছেড়ে দাও। এখন ছ'টা বাজতে পাঁচ। আমরা এখন ব্ল্যাক বেঙ্গল ইনগুরেট করব। পল নিশ্চয়ই পাঁচ মিনিট পরে ফোন করে একটা খবর দেবে!'

দার্জিলিং মেলের লিঙ্ক ট্রেনটা একটু দেরিতেই চলছিল। আমবাড়ি স্টেশনে ট্রেনটা তখন ঢুকছিল। ছোলা-বাদাম বিক্রেতা পবন দৌড়াচ্ছিল ট্রেনটার দিকে। স্টেশনে খুব ভিড় না থাকলেও লোকজন মন্দ ছিল না। হাতের ঝুড়িটা মাথার উপর তুলে পবন প্রায় থেমে যাওয়া ট্রেনের একটা কামরা লক্ষ করে ছুটছিল। ট্রেনের একটা কামরা তখন কয়েক মিটার দূরে। পবন শুনতে পেল ব্রেক কষার শব্দ। এই পর্যন্ত গোটা স্টেশনে সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরেই একটা কান ফাটানো শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সবকিছু চিরকালের মতো অন্ধকার হয়ে গেল পবনের চোখে।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে কামরার দরজাটা উড়ে এসে আছড়ে পড়েছিল পবনের উপর। এক মিনিট পর আতঙ্কিত, বিপর্যস্ত, বারুদের গন্ধ মাখা স্টেশনের এক কোনা থেকে একটা এসএমএস উড়ে গেল বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোনে। তিনি সেটা পড়লেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি। তিনি বাকি তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের যাত্রা শুরু হল বয়েজ! পলের বোমা ফেটেছে।'

দাসবাবু ব্যাগ থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বার করলেন। ফোয়ারা ছোটানো অবশ্য হল না। পরিবর্তে সবাই এক পাত্র করে পান করলেন। আরও আধ ঘণ্টা পর বুদ্ধ ব্যানার্জি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন যে তিনি চলে যাবেন। বাকি তিনজনও বার হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। রঞ্জিত বেরিয়ে গেল সবার আগে। সুরেশ কুমার বার হল তার মিনিটখানেক পর। ওঁরা দু'জন আলাদা দুটো গাড়িতে চলে যাবেন এখান থেকে। বুদ্ধ ব্যানার্জিকে অন্য একটা রিসর্টে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দাসবাবুর। তাই তিনি বুদ্ধ ব্যানার্জির জন্য বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মিনিট দশেক পর হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে এলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। দাসবাবু গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি।

'একটা খুব জরুরি কাজ বাকি আছে দাস।' তিনি বললেন।

'বলুন।'

'রঞ্জিত কি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী?'

দাসবাবু কথাটা ধরতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন প্রশ্নকর্তার দিকে।

'রঞ্জিত কিন্তু ধরে ফেলেছিল যে আমি কোনও গন্ডগোল করছি। সে আমাকে গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে ফলো করেছিল।'

'জানি।'

'তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানো যে, ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর ব্যাপারে সে খুব একটা খুশি নয়? সে ক্যাভেন্ডিসের হয়ে কাজ করছে।'

'কী বলছেন?' দাসবাবু আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান। বুদ্ধ ব্যানার্জির চোখে চোখ পড়েছে তাঁর। সেই চোখে হিমশীতল এক চাউনি। এই চাউনির একটাই অর্থ। দাসবাবু কেঁপে উঠলেন।

'রঞ্জিত আজ রাতে কোথায় থাকবে জানো নিশ্চয়ই?'

'জানি দাদা!' দাসবাবুর গলাও কঠিন শোনাল এবার। তিনি জানেন কী নির্দেশ আসছে।

'ব্ল্যাক বেঙ্গল ওকে ছাড়াই চলতে পারে, তা-ই না?'

'ইয়েস!' দাসবাবু প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে নিলেন। বহু দিনের বিশ্বস্ত রিভলভারটা সেখানে ঘুমাচ্ছে।

'তুমি জানো কী করতে হবে। গাড়ি আমি নিজে ড্রাইভ করে চলে যেতে পারব। তুমি কাজটা সেরে কাল দেখা করবে আমার সঙ্গে।'

ধীরপায়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। পরদিন ভোরবেলায় নাগরাকাটার কাছে খুনিয়া মোড়ের জঙ্গলে যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেল, তার সংবাদ মিডিয়ায় জায়গাই পেল না। কারণ আমবাড়ি স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বিস্ফোরণের খবর বেশ কয়েকদিন দখল করে রেখেছিল মিডিয়ার সিংহভাগ স্পেস। মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে সেই বিস্ফোরণে। রঞ্জিতকে খুব কাছ থেকে গুলি করেছিলেন দাসবাবু। গুলি করার আগে অবশ্য বলেছিলেন, 'সরি।' তবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে দাসবাবুর অনুশোচনা হয়েছিল।

(ক্রমশ)

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

৪৭

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল।

মহালয়ার রাত জুড়ে জলপাইগুড়ি টাউনে দেদার বাজি পোড়ানো হয়। ভোর হলে লোকজন বেরিয়ে পড়ে কুশল বিনিময় করতে। আগের দিন থেকে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যায় বলে ছেলেরা সে দিন সকাল থেকেই পুজোর আনন্দে গা ভাসাবে বলে হুটোপুটি শুরু করে দেয়। শোভা বাপের বাড়ি থাকার কারণে যে কোনও অছিলায় জলপাইগুড়ি চলে আসাটা ইদানীং গগনেন্দ্র রপ্ত করে ফেলেছে। অবশ্য কেবল শোভা নয়, গোটা শহরটাই তাকে টানতে শুরু করেছে আবার। হিদারুর সঙ্গে যখন ঘুরে বেড়াত এ শহরে, তখনই তাকে টেনেছিল এই ছোট্ট সাজানো-গোছানো শহরটা। নেটিভ স্টেট বলে কোচবিহারের ভূখণ্ডে বসে রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপ খুব একটা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এ শহরের লোকজনের অন্যতম প্রিয় বিষয় হল রাজনীতি। গোপাল ঘোষের কথায়, পলিটিক্সের কেটলিতে ফুটছে টাউনটা।

কিন্তু তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল শোভার উদ্দেশে অভিসার। এখন সেই রোমাঞ্চের দিন অতীত। এখন টাউনে পা দিয়ে দিদির বাড়িতে মালপত্র পাঠিয়ে আগে দৌড়ায় নতুন ইয়ারদোস্তদের বাড়ি। টাউনে মহালয়ার মজা দেখবে বলে সে এসেছিল গতকাল সকালে। এসেই জেনেছে যে, কলকাতা থেকে পুজোর মালপত্র নিয়ে স্পেশাল ট্রেন চলে এসেছে স্টেশনে। দারুণ সব মালপত্র এসেছে এবার। ট্রেনের দোকান বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা। কলকাতার বিখ্যাত কমলালয় স্টোর্স ছাড়াও এমবি সরকার, ঘোষ জুয়েলার্সের মতো দোকানও থাকছে ট্রেনে।

স্টেশনে গিয়ে গগনেন্দ্র দেখছিল বেজায় ভিড়। কামরাগুলোর প্রতিটা দোকানে দামি দামি জিনিস ভরতি, কিন্তু পাহারার কোনও বালাই নেই। টাউনে চুরি-ডাকাতি কিছু ঘটে না বললেই চলে। স্পেশাল ট্রেনে দোকান সাজিয়ে আসা পসারিরা এটা জানেন বলেই পুলিশ-টুলিশ মোতায়েনের ঝামেলায় যান না। দোকানে কেনাকাটা সেরে দিদির বাড়িতে গগনেন্দ্র ফিরেছিল রাত ন'টা নাগাদ। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে গিয়েছে রাহুতবাড়ির মাঠে বায়োস্কোপ দেখতে। ততক্ষণে কৃষ্ণা চতুর্দশীর তমসাচ্ছন্ন আকাশের বুকে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে একের পর এক বাজি। পাটগোলার মাঠে বিখ্যাত এক বাজিকর তাঁবু গেড়ে বসেছেন। তিনি বরাত পাওয়ার আশায় আজ রাতে বাজির কিছু নমুনা প্রদর্শন করবেন। গোপাল ঘোষ সেখানে গিয়েছেন।

বায়োস্কোপ দেখার পর অবশ্য গগনেন্দ্র দিদির বাড়িতে ফিরে এসে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নিয়ে যাবে নিত্যদার বাড়ি। কিন্তু তার ঘুম ভাঙল কাকভোরে প্রবল বাজি-পটকা আর হুল্লোড়ের শব্দে।

চোখ কচলে বাইরে এসে দেখল তীব্র উৎসাহে জামাইবাবু তুবড়ি পোড়াচ্ছে। তারপর দূর থেকে ভেসে আসা দুটো বিকট শব্দে ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে গেল তার।

'মনে হচ্ছে পটকা নয়, দুটো বোমা ফাটল!' দিদির গলা শুনতে পেল গগনেন্দ্র— 'স্বদেশিরা মনে হয় এই সুযোগে বোমা ফাটানো অভ্যেস করছে।'

গগনেন্দ্রর মনে হল, দিদি ভুল কিছু বলছে না। কাল রাতে বায়োস্কোপ দেখার সময় একটা বিকট শব্দ শুনেছিল সে। চিনেপটকার অত শব্দ হয় না। দিদিকে সমর্থন জানিয়ে সে বলল, 'ঠিক বলেছিস।'

তারপর তাড়াহুড়ো করে এক পেয়ালা চা-পান করে গায়ে চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পথে। পাড়ায় সচ্ছল লোকের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাজি পোড়ানো দেখতে দেখতে গগনেন্দ্র ধীরপায়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিল প্রথমে। সামনেই ব্যানার্জিদের বিরাট কাঠের তৈরি বৈঠকখানার ঘর। সামনের উঠোনে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। লখনউ থেকে এক বাদক এসেছেন। সারারাত গানবাজনা হয়েছে। এখনও চলছে।

কিছুটা সময় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোর পর আকাশ খানিকটা ফরসা হতে গগনেন্দ্র বুঝল যে, সে অজান্তেই শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় ঢুকে পড়েছে। সে বাড়ির সামনে আসতেই নজরে পড়ল বাইরের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আছে অজস্র চিনেপটকার দগ্ধাবশেষ। শ্বশুরের বৈঠকখানার ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা। ভিতর থেকে ভেসে আসছে শোভার গান।

গগনেন্দ্র চনমনে হয়ে উঠল সেই গান শুনে। দ্রুত বৈঠকখানা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই শ্বশুরের নজরে পড়ে গেল সে। খুদিদা আহ্লাদের গলায় চিৎকার করে বললেন, 'আরে, জামাই এসেছে! এসো বাবাজীবন! আমি আর শোভা তো ভেবেছিলাম কালই আসবে! তা বীরেনের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ সকালে?'

'না তো!' গগনেন্দ্র অবাক হয়, 'এখানে এসেছিল?'

'এই তো গেল। ও বাড়ি গিয়ে শুনেছে তুমি বেরিয়েছ। বীরেন বলেছে, আটটা-ন'টার দিকে তুমি যেন অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করো। সে বাসায় থাকবে। তবে তার এখনও দেরি আছে। আগে ঘরে যাও।'

খুদিদা উঠে পড়লেন। পুজো এসে গেল। মেয়ে-জামাই নিয়ে অনেক আনন্দ করতে হবে এবার।

এখন বীরেনের বাড়ির দিকেই ব্যস্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল গগনেন্দ্র। সকাল সাড়ে আটটা। চমৎকার নরম রোদ্দুরে ভরে আছে চারদিক। সেই রোদ্দুর গায়ে মেখে নিজের বাড়ির চমৎকার সাজানো লনে একটু অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল বীরেন। গগনেন্দ্রর কাছে সংবাদ পৌঁছেছে কি না তা স্পষ্ট নয়। অথচ যেটা সে জেনেছে তা নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র গগনেন্দ্র।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতভাবেই ঘটেছে। তাদের পাড়ার মহেন্দ্র নামের একটি ছেলে প্রায় দু'বছর হল নিরুদ্দেশ। মহেন্দ্রর বাবা রজনিবাবু নামী কন্ট্রাক্টর। তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও ছেলের খোঁজ পাননি। ব্যবসার সূত্রে বীরেনের সঙ্গে রজনিবাবুর প্রায়ই কথাবার্তা হয়। বীরেন খোঁজ নিয়ে দেখেছে যে, পুলিশের কাছে সত্যিই কোনও খবর নেই নিখোঁজ মহেন্দ্রর। কিন্তু গতকাল বিকেলের ডাকে রজনিবাবু একটি চিঠি পেয়েছেন। সে চিঠিতে মহেন্দ্রর নিজের স্বাক্ষর। কয়েক ছত্র লিখে সে জানিয়েছে যে, পুজোর ঠিক আগে এক ব্যক্তি দেখা করবে রজনিবাবুর সঙ্গে। তার হাতে যেন বেশ কিছু টাকা দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় রজনিবাবুর বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে চিঠির হস্তাক্ষর তাঁর ছেলের নয়। সন্দেহের নিরসন ঘটাতে তিনি ছেলের বই-খাতা থেকে হাতের লেখার নমুনা মেলাতে গিয়ে তিনটে চিঠি পান। চিঠির লেখক জনৈক উপেন এবং সদ্য আসা চিঠির হস্তাক্ষরের সঙ্গে মহেন্দ্রর অক্ষরের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও সেই অজানা উপেনের লেখার সঙ্গে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। কথাটা কাল রাতে শোনার পর থেকেই বীরেন উত্তেজনায় ছটফট করছে। রজনিবাবুর কাছ থেকে উপেনের লেখা চিঠিগুলো নিয়ে রেখেছে সে। প্রতিটা চিঠির মূল বক্তব্য একটাই— ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে পড়া। কোনও চিঠিতেই তারিখ নেই। টাকার কথা জানিয়ে পাঠানো চিঠিতে যে মাথাভাঙা ডাকঘরের মোহর স্পষ্ট, সেটা রজনিবাবু জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বীরেন নিশ্চিত যে উপেন এবং মহেন্দ্রর মধ্যে যোগাযোগ আছে। হয়ত একসঙ্গেই আছে তারা। কিন্তু এই উপেন আর তার উপেন যে একই ব্যক্তি, সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে গগনেন্দ্র এলে। সে উপেনের হাতের লেখা চেনে।

গগনেন্দ্র এল ন'টা বাজতে দশ মিনিট আগে। আর সে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শনাক্ত করল উপেনের হস্তাক্ষর। তার বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা নিরসন করে বীরেন্দ্র একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, 'শুধু একটা প্রশ্নেরই জবাব পাচ্ছি না ব্রাদার! মহেন্দ্র কেন নিজে লিখল না চিঠিটা?'

'হয়ত সে আহত! লিখতে পারছে না!' গগনেন্দ্র উত্তেজিত স্বরে ব্যাখ্যা করে, 'এই জন্যই টাকার দরকার পড়েছে। চিঠি পোস্ট করা হয়েছে মাথাভাঙা থেকে। নিশ্চয়ই দু'-একদিনের মধ্যেই পোস্ট হয়েছে। আমি গত এক সপ্তাহ জামালদহে ছিলাম। আমার মনে হয়, উপেন মাথাভাঙা পর্যন্ত এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু জামালদায় আসতে না পেরে চিঠি লিখেছে।'

'তাহলে সে কেন তোমাকে চিঠি লিখল না?' বীরেন মাথা ঝাঁকিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, 'আমার ধারণা, উপেন আর মহেন্দ্র কোথাও লুকিয়ে আছে। চিঠি ডাকে দিয়েছে কোনও লোক মারফত। মহেন্দ্রর আহত হওয়ার ব্যাপারটা খারাপ বলোনি। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে মহেন্দ্র বেঁচে নেই?'

'তাহলে উপেন টাকা চেয়ে চিঠি লিখত না!' গগনেন্দ্র দৃঢ় স্বরে বলল কথাটা, 'আমার শ্বশুরের কাছে তার নামে অন্তত তিনশো টাকা পড়ে আছে। আমার মনে হয় টাকা মহেন্দ্রর দরকার।'

'রজনিবাবুকে বলব ব্যাপারটা গোপন রাখতে।' বীরেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টিন তুলে নিল হাতে— 'যে টাকা নিতে আসবে, তাকে যদি আমরা ফলো করি, তবে উপেনের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না! দরকার হলে ফলো করার লোক লাগাব। এটা একটা সুযোগ। দৈবাৎ আমরা সুযোগটা পেয়ে গিয়েছি। এটা হাতছাড়া করা চলবে না।'

উত্তেজনার প্রাবল্যে চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছে গগনেন্দ্রর। টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে সে-ও ধরিয়ে ফেলে। তারপর কাশি সামলাতে সামলাতে আরও লাল হয়ে গিয়ে বলতে থাকে, 'এক্সেলেন্ট আইডিয়া!'

মহালয়ার প্রভাত ক্রমে গড়িয়ে যেতে থাকে বেলার দিকে। অদূরে বারোয়ারি পুজোর অর্ধসমাপ্ত মণ্ডপের সামনে কর্তাব্যক্তিদের হইচই শুরু হয়। শাড়ি-চুড়ির পসরা নিয়ে হেঁকে যেতে থাকে বাইরে থেকে আসা ফেরিওয়ালার দল। ফুরফুরে হাওয়ায় দুলে ওঠা শিউলি গাছের থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়ে আরও দু'-চারটে ফুল। শরতে সেই পবিত্র আবহাওয়ায় অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের গন্ধ পাওয়া দুই যুবক ঘন ঘন ধূম্র এবং চা-পানের সঙ্গে মেতে ওঠে গভীর আলোচনায়। রজনিবাবু ছাড়া আর কেউ জানবে না এসব। অত্যন্ত গোপনে তারা শুরু করবে উপেনকে খুঁজে বার করার কাজ। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

কিন্তু আমার মনে হল, ডুয়ার্সের হরিদ্রাভ আত্মা বীরেন এবং গগনেন্দ্রর পানে চেয়ে মুচকি হাসলেন। *(ক্রমশ)*

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

ফলকের নুনিয়া ফলন

'বম্বে ডাক' থেকে এবার কালো নুনিয়া। উত্তরবঙ্গের জগদ্‌বিখ্যাত এই চালের সঙ্গে ফলক নামক ব্যক্তির কী সম্পর্ক? বাংলা টিভি সিরিয়ালের জগৎ বদলের যুগে ফলকের আবির্ভাব। সে একবার ছোট বাক্সে উপহার আনল ছোট্ট হার্লে ডেভিডসন। চলচ্চিত্রজগতের নেপথ্য জগতে নীরবে কাজ করে যাওয়া অসংখ্য মানুষের একজনের প্রসঙ্গ এবার কর্মাভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বার করে এনেছেন লেখক। উসকে দিয়েছেন কালো নুনিয়ার সুগন্ধ। উপভোগ করুন।

—দাদা, একটা জিনিস এনেছি আপনার জন্য...

আমার পাশের খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল ফলক। মুখে ওর সেই স্বভাবসিদ্ধ মিটিমিটি হাসি। ওর কথাটা পুরনো একটা স্মৃতি উসকে দিল মনে। বছর দুই আগের স্মৃতি। প্রথমবার যখন একসঙ্গে একটা বিজ্ঞাপনচিত্র বানানোর কাজ করেছিলাম। বিজ্ঞাপনের গল্পটা আমার কল্পিত। আর পরিচালনায় ফলক।

শুটিং-এর দিন সকালে স্টুডিয়োতে এসে দেখলাম, ফলক ওর গাড়ির ডিকি খুলে গাদাখানেক দারুণ দারুণ প্রপস বার করে দিচ্ছে আর্ট ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্টদের হাতে। কাঠের তৈরি মিনিয়েচার নৌকো, ক্রিস্টালের শোপিস, মেটালের তৈরি মিনিয়েচার হার্লে ডেভিডসন মোটরবাইক... এবং আরও কত কী। প্রত্যেকটা জিনিস দেখার মতো।

—সব তোমার নিজের কালেকশন? জিজ্ঞেস না করে পারিনি।

জবাবে ফলক মিটিমিটি হেসে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'যখনই যেখানে শুটিং-এ যাই বা বেড়াতে যাই, টুকটুক করে কিনে ফেলি! একটা একটা করে এভাবেই কত কালেকশন হয়ে গিয়েছে দেখুন। শখ করে কেনাও হল, আবার শুটিং-এর দরকারেও লেগে যায়।'

অবধারিতভাবে মনে পড়ে গিয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের কথা। শুটিং-এর সেট হোক বা নিজের অফিস, সবখানেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের ফার্নিচার, পেইন্টিং ও প্রপস ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন তিনি। সম্পাদক হিসেবে শেষ যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখানে দেখেছিলাম দপ্তর সাজানোর জন্য সোফার কুশনগুলো পর্যন্ত তাঁর নিজের বাড়ি থেকে আনানো।

বুঝতে পারলাম, প্রপস সংগ্রহ ও ব্যবহারের বেলায় ফলকও ওই একই পথেরই পথিক। অল্প বয়সেই পরিচালনায় ওর খুব নাম হয়েছে। তবে সিনেমা বা সিরিয়াল নয়। ওর কাজ টেলিভিশনের নতুন নতুন প্রোগ্রামের জন্য প্রোমো তৈরি করা। সিনেমার যেমন ট্রেলার, টিভি প্রোগ্রামের তেমন প্রোমো। একটা সময়ে সেই প্রোমো তৈরি করতে আমাদের প্রচুর সময় চলে যেত প্রোগ্রামের শুটিং রাশ ঘেঁটে ঘেঁটে। কারণ, তার মধ্যে থেকেই কিছু ভাল শট বেছে নিয়ে প্রোমো তৈরি করার দস্তুর ছিল তখন।

তবে বেসরকারি চ্যানেলের যুগে, ক্রমে চাকচিক্য আর জাঁকজমকের দাবি বাড়তে লাগল চ্যানেলের তরফ থেকে। প্রোডাকশন মিটিং-এ মুম্বই ফেরত চ্যানেল কর্তারা তখন বলতেন, আমাদের চ্যানেলের সিরিয়ালে গরিবদের ঘরটাও সাজানো-গোছানো, ঝকঝকে দেখতে হতে হবে। সুতরাং

সাদামাটা শুটিং রাশ দিয়ে প্রোমো বানানো তাঁদের স্ট্যান্ডার্ডে একেবারে নৈব নৈব চ! ২০০২ কি ২০০৩ সাল থেকে প্রায় সব চ্যানেলই প্রোমোর জন্য আলাদা স্ক্রিপ্ট ও শুটিং-এর নিয়ম চালু করে দিল। তাতে এক মিনিটের একটা প্রোমো তৈরির খরচ, গোটা একটা বাইশ মিনিটের এপিসোডের চেয়ে বেশি হলেও, সে বাজেট অনায়াসে মঞ্জুর!

ফলকদের জেনারেশন এর কিছুদিন পর থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দেয়। যখন চ্যানেলগুলো প্রোমো এবং কিছু কিছু নন-ফিকশন প্রোগ্রাম আর বাইরের প্রোডিউসারদের হাতে না ছেড়ে, নিজেদের ইন হাউস টিম দিয়ে সবে বানানো আরম্ভ করেছে। রূপকলা কেন্দ্র থেকে ফিল্ম স্টাডি শেষ করে ফলক ঢুকে পড়েছিল তেমনই এক নামজাদা চ্যানেলে। তারই বড় বড় প্রোগ্রামের প্রোমোশনাল ভিডিয়ো বানাতে এখন সে আসমুদ্রহিমাচল চষে বেড়ায়। সারা বছরই তাকে ঘিরে রাখে সে কাজের চূড়ান্ত ব্যস্ততা।

সেই একই ধরনের কাজের মধ্যে কিছুটা স্বাদ বদলের জন্য সেবারে আমাদের হাউসের সঙ্গে জীবনে প্রথমবার বিজ্ঞাপনের ফিল্ম বানাচ্ছিল সে।

ওর প্রপস কালেকশনের মধ্যে মিনিয়েচার হার্লে ডেভিডসন বাইকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। অত ছোট্টর মধ্যেও বাইকের প্রত্যেকটা পার্টস একদম নিখুঁতভাবে গড়া। সত্যিই দেখার মতো বস্তু!

কথায় কথায় তা বলে ফেললে ফলক জানিয়েছিল, ওটা ব্যাংকক থেকে কেনা। সত্যি বলতে কী, অ্যাড ফিল্মের কাজ চুকে যাওয়ার পরে আমি সেই বাইকের কথা ভুলেও গিয়েছিলাম। কয়েক মাস বাদে হঠাৎ একদিন ফলক অফিসে এসে হাজির। একটা ছোট্ট সাদা কার্ডবোর্ড বাক্স হাতে তুলে দিয়ে বলল, ব্যাংকক গিয়েছিলাম। এটা আপনার জন্য এনেছি।

বলাই বাহুল্য, বাক্স খুলতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ব্রোঞ্জ রঙের সেই বাইক! যেটা হাতে পেয়ে বেশ লজ্জিতই বোধ করছিলাম। কারণ, আমার মন থেকে তো জিনিসটার ছবি মুছেই গিয়েছিল। অথচ শুটিং-এর ফ্লোরে কয়েক মুহূর্তের জন্য তার যে কদরটুকু করেছিলাম, ফলক তা ভোলেনি।

ফলে, এত বড় পুরস্কার হাতে পেয়েও মন থেকে সেটা মেনে নেওয়া আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল সে দিন। অপরাধবোধে মনে হচ্ছিল, আমি কি আদৌ এর যোগ্য?

আজ দু'বছর বাদে আবার একটা বিজ্ঞাপনী ছবি তৈরির ব্যাপারে মিটিং করতে ফলক এসেছে অফিসে। এবং এসে প্রথমেই যখন বলল উপহার এনেছে, আমি তৎক্ষণাৎ

কালো নুনিয়া? সত্যি বলছ? আমি তো স্রেফ ভয়ের চোটে ওই নামটা বললাম না। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, তখনই শুনতাম এই চাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি পেলে কোথায় এটা? উত্তরে ফলক এবার সব চেয়ে বড় চমকটা দিল। হেসে বলল, আমার নিজের জমিতে ফলিয়েছি!

পুরনো স্মৃতির রেশ টেনে জিজ্ঞেস করলাম, আবার?

—হ্যাঁ, আবার।

ফলক চওড়া করে হাসল। পেটেন্ট পেটফোলা কালো ব্যাগটা কোলে বসিয়ে ও চেন খুলতে ব্যস্ত। আর আমি ভাবছি, এবার আবার কী সারপ্রাইজ আছে। এবং দেখা গেল, সত্যিই সে এক অভূতপূর্ব সারপ্রাইজ!

ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল একটা সেলোফেনের বড় প্যাকেট। সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে ও বলল, দেখুন তো চেনা লাগছে কি না?

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, স্বচ্ছ প্যাকেটের ভিতর বেশ খানিকটা চাল রয়েছে। অদ্ভুত ধাঁধা তো! আমি কী বুঝব চাল দেখে? কৃষিবিজ্ঞানী নই! হকচকিয়ে ফলকের দিকে তাকাতে সে হেসে উঠল।

—আরে, আগে প্যাকেটটা খুলুন।

—খুলে?

—গন্ধ শুঁকে দেখুন, কিছু মনে পড়ে কি না!

আমি বাধ্য ছাত্রের মতো ওর নির্দেশ মান্য করলাম। আজকাল আঙুলে টিপে সিল করা যে সেলোফেন প্যাকেটগুলো হয়, এটাও সেরকম। দু'হাতে প্যাকেটের মুখ ধরে টানতেই চড়চড় করে সিল খুলে গেল। আমি মাথা নিচু করে নাক ডোবালাম প্যাকেটের ভিতর। আর সঙ্গে সঙ্গে আমায় ছেঁকে ধরল এক দুর্দান্ত সুগন্ধ।

আয়ুর্বেদ মতে, নাকের ভিতর দিয়ে নাকি চট করে মগজের অতি গভীর অঞ্চলেরও নাগাল পাওয়া সম্ভব। এই সুন্দর গন্ধটি ঠিক সেই কাজটাই করল। আমার মনের গভীরে সেঁধিয়ে আশ্চর্য কিছু নিউরোকেমিক্যাল ম্যাজিক ঘটাল, যার পরিণামে মনের ভিতর জীবন্ত হয়ে জেগে উঠল অতি প্রিয় এক পুরনো ছবি।

জানালা দিয়ে তেরচাভাবে সকালের রোদ এসে পড়ছে জলপাইগুড়িতে আমাদের বাড়ির রান্নাঘরে। বড় মাটির উনুনের উপর ধোঁয়া-ওঠা হাঁড়িতে ফুটছে ভাত। আর ঠিক এই চালের সুগন্ধেই ম ম করছে গোটা ঘরটা। প্রাতরাশে কিছু একটা ভাজার সঙ্গে ঘি-মাখা সেই ফেনা ভাত যেন একদম অমৃত!

মনে মনে সেই স্বাদকে স্মরণ করে নিয়েই ফলককে বললাম, এ তো আমার ছেলেবেলার হারানো গন্ধ!

—সে তো হতেই হবে। কিন্তু বলুন দেখি, কী চাল এটা?

চালের চেনা নামটাই বলতে চাইলাম। ছেলেবেলায় দিনবাজারের চালপট্টিতে গিয়ে বরাবর এই একটাই চাল অর্ডার করতে শুনতাম বাড়ির বড়দের। নুনিয়া চাল। কিন্তু ফলককে সে নামটা বলতে বাধল। এখনকার হাইব্রিড আর বাসমতী চালের যুগে কবে হেরে আর হারিয়ে গিয়েছে নুনিয়া। এই চাল নিশ্চয়ই তার কোনও আধুনিক উত্তরসূরি হবে। তাই বললাম, গন্ধটা চেনা লাগছে ঠিকই। কিন্তু কী চাল, বলা মুশকিল আমার পক্ষে।

ফলক রীতিমতো বিস্মিত স্বরে বলল, সে কী! এটা আপনার বলতে পারা উচিত ছিল। এ তো আপনাদের নর্থ বেঙ্গলের কালো নুনিয়া চাল, দাদা!

—কালো নুনিয়া? সত্যি বলছ? আমি তো স্রেফ ভয়ের চোটে ওই নামটা বললাম না। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, তখনই শুনতাম এই চাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি পেলে কোথায় এটা?

উত্তরে ফলক এবার সব চেয়ে বড় চমকটা দিল। ব্যাগ থেকে আরও দু'খানা একই রকম দেখতে চালের প্যাকেট বার করে টেবিলের উপর রাখল সে। তারপর গর্বের হাসি হেসে বলল, আমার নিজের জমিতে ফলিয়েছি! আপনাদের সবার জন্য অল্প অল্প নিয়ে এলাম।

কী বলছে কী ছেলেটা? উড়ন্ত ড্রোন ক্যামেরায় কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরে সূর্যোদয়ের প্রথম রং ধরতে যে পরপর চার-পাঁচ দিন ভোররাত থেকে দার্জিলিং মলে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে... শুটিং ফ্লোরে যে সৌরভ গাঙ্গুলি, শান্তনু মৈত্র কিংবা মিকা সিং-এর মতো সেলেব্রিটিদের পজিশন আর লুক বুঝিয়ে দেয়... একটা জটিল শটকে নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করতে অসীম ধৈর্যে যে একটার পর একটা রিটেক নিতে থাকে অক্লান্তভাবে, সে কিনা নিজের জমিতে ধানও ফলায়?

কৌতূহলের বশে এবারে তাই জিজ্ঞেস করতেই হল, কোথায় তোমার জমি?

—বর্ধমানের কাছেই। যেখানে আমাদের

দেশের বাড়ি।

অল্প দিনের আলাপ হলেও এটা জানতাম, কলকাতায় কড়েয়া রোডের ফ্ল্যাটে ফলকের ছোটবেলা কেটেছে। আর বিয়ের পরে এখন ও খিদিরপুরে শিফ্‌ট করে গিয়েছে। তবে চাষাবাদের যে ব্যাকস্টোরিটা এবার ও বলল, সেটা সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

—আমার দাদু তো চাষবাস নিয়েই গোটা জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। ইউনিক সব ধান চাষ হত আমাদের জমিতে, জানেন। ওরকম স্বাদ-গন্ধ আজকাল কোথাও পাবেন না। বোধহয় দাদুর শেষ বয়সেই, একবার বিছনের ধানগুলো কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাস, তারপর থেকে সেই ধান হারিয়ে গেল। আর আপনি ওই যে বললেন না, ছেলেবেলার গন্ধ? এটা আমারও নস্টালজিয়া, জানেন। আমার ছোটবেলায় দেশ থেকে চাল আসত বাড়িতে। আর যে দিন মা ওই চাল রান্না করত, বিশ্বাস করবেন না, নিচে মাঠে খেলতে খেলতেই নাকে গন্ধ ভেসে আসত। বুঝতাম, আজ পোলাও হচ্ছে। জলদি খেলা গুটিয়ে স্নান-টান করে রেডি হওয়ার তাড়া পড়ে যেত।

—তো, তুমি কবে থেকে আবার এই চাষবাস শুরু করলে?

—খুব বেশি দিন না, দাদা। বলতে গেলে, এটাই প্রথম সিজন। বছরে এতবার করে নর্থ বেঙ্গল যেতে হয় শুটিং-এর দরকারে। হঠাৎ হঠাৎ কোথাও ভাতে সেই চেনা গন্ধ পেতাম। জিজ্ঞেস করলে সবাই বলত, এটা নুনিয়া চালের ভাত। সেই থেকে আমি লেগে পড়লাম এই ধান জোগাড় করার কাজে। ভাবলাম, দেশে জমি তো পড়েই রয়েছে। যদি এই ধানটা অন্তত ফলাতে পারি, দাদুর লেগাসিটা বজায় রাখা যাবে!

—অসাধারণ সুন্দর পরিকল্পনা, ফলক! হ্যাটস অফ টু ইউ।

আমি তারিফ না করে পারলাম না। মিডিয়া লাইনের ওয়ার্কলোড, কম্পিটিশন এবং আরও নানা হ্যাপা যেখানে মানুষগুলোকে পুরো যন্ত্র বানিয়ে দেয়, সেখানে ফলকের মধ্যে এই রোমান্টিকতা একটা বিরাট ব্যতিক্রম।

প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে এবারে চালের উৎস জানতে প্রশ্ন করলাম আমি, ধান জোগাড় করলে কীভাবে?

—সে এক ইতিহাস! প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে যখনই নর্থ বেঙ্গল যাই, তখনই খোঁজ করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, চালটা অনেক জায়গাতেই পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ধানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না।

এদিকে আমি তো রীতিমতো অবসেসড। ধান আমায় খুঁজে পেতেই হবে। এমনকি বিয়ের সবে পরে পরে জয়গাঁতে গিয়েছি আমার মিসেসের এক আত্মীয়র বাড়ি, প্রথমবার। নতুন জামাইয়ের জন্য দুপুরে এলাহি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর আমি, খেতে বসে নুনিয়া চালের ভাত দেখে, সব ভুলে ইন্টারোগেশন জুড়ে দিয়েছি ধানের সন্ধানে। সে এক কাণ্ড!

আমার ফোনটা বেজে ওঠায় ফলকের কাহিনিতে ছেদ পড়ল। আমার বসের ফোন। কল রিসিভ করতে উনি জানালেন, রাস্তার জ্যামে আটকে গিয়েছেন। পৌঁছাতে একটু দেরি হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের অ্যাড ফিল্মের মিটিংটা আর একটু পিছিয়ে গেল। অতএব, আমরা আরেক রাউন্ড চা-সহকারে আবার ডুব দিলাম ফলকের ধান আবিষ্কারের কাহিনিতে।

—তারপর বুঝলেন, এবারের শীতে একদম পাকা খবর পেলাম। আমার এক ভায়রাভাই কৃষি দপ্তরে রয়েছে, ওই নর্থ বেঙ্গলেই। সে খবর দিল, ওদের দপ্তর থেকে এই নুনিয়া চাষের একটা প্রকল্প চালু হয়েছে। সেটার জন্য যে ধানের বীজ জোগাড় হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা থেকেই কিছুটা আমার হাতে আসে।

ফলক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এতটা বলে। যেন এক দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি হল। কিন্তু শুধু বীজ পেলেই চলবে? আমার মনে একটা অন্য প্রশ্ন জাগল, যেটা আমি ওর দিকে ছুড়ে দিলাম, কিন্তু জমির তারতম্যও তো দেখতে হবে? উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের কাছাকাছি একরকম মাটি। আর বর্ধমান তো বলতে গেলে রাঢ়বঙ্গ?

ফলক সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, সে, মাটি পরীক্ষাও আমি করিয়ে নিয়েছিলাম। ওই ভায়রাভাইকেই বর্ধমানে নিয়ে এসে। ও সব দেখে-টেখে বলল, এখানের যা সয়েল, তাতে আরও ভালভাবে ফলন হওয়া উচিত। আর হয়েছেও তা-ই। এক বিঘায় যতটা ধান ওরা নর্থ বেঙ্গলে ফলিয়েছে, আমার এখানে তার চেয়ে কিছুটা বেশিই হল। আপনাদের শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, চালটা একটু বেছে নিয়ে রান্না করবেন। প্রথমবার চাষ হল তো। অভিজ্ঞতা নেই। ফলে আমি কাঁকর বাছার মেশিনটার ব্যবস্থা করতে পারিনি।

—আরে, সামান্য কাঁকর নিয়ে কী মাথা ঘামাচ্ছ? তুমি যে হাতেকলমে একটা প্রায় বিলুপ্ত ধান ফলিয়ে ফেললে, আমি তো এটা ভেবেই হতবাক হয়ে যাচ্ছি। এত ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা কী করে বার করলে?

—ও, চেষ্টা করলে ঠিক হয়ে যায়, দাদা। এখন তো চাষে টেকনোলজি এসে গিয়েছে। জমিতে হাল দেবেন কি জল দেবেন, সব মেশিন ভাড়া পাওয়া যায়। ওসব কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। ওগুলোর সময় আমি উইকএন্ডে চলে যেতাম। কলকাতা থেকে গাড়িতে কয়েক ঘণ্টার মামলা। ধান কাটার সময়ও তা-ই করেছি। আর মাঝখানের কয়েক মাস সময়টা জমি দেখার জন্য লোক রাখা ছিল। আরে দাদা, এইটুকুই তো জোগাড়যন্ত্র করতে হয় আমাদের। আর ধানে শিষ আসা কিংবা ফসল ঠিকঠাক পেকে ওঠা— এই আসল কঠিন কাজগুলো তো প্রকৃতিই করে দিচ্ছে, একেবারে নিঃশব্দে!

সহজ কথায় কত বড় একটা সত্যি সে দিন বলে দিল ফলক। আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও, ভাবনায় এতটা বড় যে, আপনা থেকেই শাবাশ বলতে হয়। বছরভর কৃত্রিম আবেগ-অনুভূতির নাটক নিয়ে মায়াছবি বানালে কী হবে, প্রকৃতির অকৃত্রিম আবেদনকে ও একেবারেই ভোলেনি।

আমি বললাম, এটা চালিয়ে যেতে পারবে? সবে তো তোমার প্রফেশনাল কেরিয়ারে বড় সুযোগগুলো আসতে শুরু করেছে?

ফলক হেসে উঠল। অনাবিল সারল্য সেই হাসিতে। যে সারল্যকে দেখলে প্রত্যয় হয়, ভোগবাদ কিংবা বস্তুবাদ একে চট করে বাগ মানাতে পারবে না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সে বলল, এসব শুটিং-টুটিং আর কতদিন দাদা? শেষ জীবনটা টেনশন ফ্রি কাটাতে হবে তো! নিজের জমির চালের ভাত খেয়ে, এই যে রোজ সকালে মজাসে বেরচ্ছি— এটাও কি অ্যাচিভমেন্ট নয়?

আমি নির্বাক শ্রদ্ধায় সেলাম জানালাম ওর মানসিকতাকে। এবং লজ্জার সঙ্গে অনুভব করলাম, হয়ত ওর আজকের এই উপহারটিরও যোগ্য আমি নই। ওর মতো এমন মানসিকতার বলেই হয়ত লাটাগুড়ির জঙ্গলে উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনার প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন আজ অসংখ্য মানুষ। গাছ কাটার বিরুদ্ধে তাঁদের নিঃস্বার্থ প্রতিরোধ আজকের সময়ে বড়ই মূল্যবান। কারণ সভ্যতার সশব্দ অগ্রগতি যতই চোখ ধাঁধানো হোক, তার প্রতিটি সুখের উপকরণের আড়ালে কিছু না কিছু অদৃশ্য অসুখ আছেই, যেটা আজকে ধরা পড়ে না। বছরের পর বছর ধরে গোপনে বেড়ে চলে এবং একদিন বিশ্ব উষ্ণায়ন কিংবা জলবায়ুর আমূল পরিবর্তনের মতো জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে মাথাচাড়া দেয়।

আমরা বাকি সবাই কবে বেরিয়ে আসতে পারব শপিং মলের ঠান্ডা স্বপ্নদুনিয়ার মোহ ছেড়ে? মাটিকে ছুঁয়ে কবে ভালবাসতে শিখব সেই মাটির সৃষ্টিশীলতা? মোবাইল ম্যাজিকের বদলে আমরা কবে আবার জগতের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় মনে করব রোদ-বৃষ্টির চিরন্তন অথচ অসামান্য রসায়নকে?

কবে? আবার কবে?

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

পাঠকের পরিক্রমা

ডুয়ার্সের ঘাট বৃত্তান্ত

ডুয়ার্স তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের বিচরণ ছিল অবাধ। স্বভাবতই এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে জলপথ বা নদীপথ ব্যবহার স্থলপথের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ ছিল। ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর মধ্যে করতোয়া, তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, কালজানি, তোর্সা, গদাধর, ডুডুয়া, গিলাণ্ডী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলে লোকবসতি ছিল নগন্য। অতীতের নদীপথ ধরেই এতদঞ্চলে পদচারণা ঘটেছে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী (কোচ-মেচ) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর। ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গল কেটে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে জনবসতি। জনসংখ্যার বিচারে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যাধিক্য।

বলাবাহুল্য এই নানা জনগোষ্ঠীর পদচারণায় ও নদীপথে বিচরণের সময় জল ও স্থলের সংযোগের স্থলে গড়ে উঠেছে ঘাট বা ঘাটের পার। যেখানেই ঘাট সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই সংযোগ হয়েছে 'ঘার্চা' (রাজবংশী শব্দ) বা পথ বা রাজপথের (ডেগর)।

'পথ' অর্থ চলার রাস্তা। পথ ধরেই মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। বিকশিত হয়েছে নানা শাখা প্রশাখায়। তাই পথের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার পথেরও যেমন আছে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা, তেমন পথ অসীমতার প্রতীক।

প্রাচীনকালে ডুয়ার্সের ঘন অরণ্যানীর মধ্যে রাস্তাঘাট সেরূপ ছিল না। তাছাড়া মূল অঞ্চলে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অত্যাচার ছিল প্রবল। তাই হিউয়েন সাং থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিব্রাজক জলপথে এতদঞ্চলে পদচারণা করেছেন। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় জলপথই ছিল ডুয়ার্সের আদিম পথ যা নদীর ঘাটের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে ভুটান আমলে ঘোড়া ও বলদের ব্যবহার এতদঞ্চলের স্থলপথের যাতায়াতের মাধ্যমকে চিহ্নিত করে।

বিভিন্ন দেবদেবী এবং ঘাটের নাম, দেবতা, বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক নিদর্শনকে প্রমাণ করতে আজও মূর্ত হয়ে আছে পথ ও ঘাট-এর বিশেষত্বের মধ্যে। আবার জলপথ ও স্থল পথের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে ঘাট-ঘাটিয়াল-গাডিয়াল। আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ নদীপথ বা জলপথের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ঘাটের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ধাই ধাই ঘাট

'ধাই ধাই' শব্দটি রাজবংশী শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্গত। 'ধাই ধাই' অর্থ বিস্তির্ণ ফাঁকা স্থান অর্থাৎ এই ঘাটটি ছিল ফাঁকা জনশূন্য। ময়নাগুড়ি বাজার পেরিয়ে উত্তরে আমগুড়ি— রামশাই যেতে রাস্তার বাঁ হাতে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে 'কলোখাওয়া' নদী। এই কলোখাওয়া নদীতে ধাই ধাই ঘাট ময়নাগুড়ি থেকে ৫/৬ কিমি ওপরে ময়নাগুড়ির পূর্বপ্রান্ত-পশ্চিমপ্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত।

কইন্যা বরের ঘাট

এই ঘাটটিও কলোখাওয়া নদীতে। লোকশ্রুতি একদা নদী পারাপারের সময় কইন্যা ও বরের নৌকা এই ঘাটে ডুবে যায়। আর তখন থেকেই এই ঘাটের নাম 'কইন্যা-বরের ঘাট' হয়েছে। আরও শোনা যায় চাঁদ সওদাগরের ডিঙা নাকি এই ঘাটেই ডুবে গিয়েছিল। কইন্যা-বরের ঘাটকে 'কইন্যা-বরের ঢ্যাম'-ও বলা হয়। রাজবংশী 'ঢ্যাম' শব্দের অর্থ ধীর। জলের স্রোত যেখানে ধীর গতি অথচ জলের গভীরতা বেশি। কবি-সাহিত্যিক বাচ্চামোহন রায়ের রচিত কইন্যাবরেক ঘাট কবিতায় অনেক পৌরাণিক কাহিনির (মিথ) উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

কালাপানির ঘাট

কালা পানি গু কালাপানি। কালা অর্থ কালো আর পানি অর্থ জল। অর্থাৎ নদীর জল যেখানে গভীর বা যেখানে 'নদীসৃষ্ট কুড়া' (গভীর জল) থাকে সেখানে জলের রং অপেক্ষাকৃত ঘন কালো দেখায়। স্থানীয় ভাষায় সেই নদীর (কুড়ার) জলকে কালা পানি বলে। কালাপানির ঘাটটি ডুডুয়া নদীতে। এই নদী বিন্নাগুড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে আংরাভাষা, ইচা, গায়ের ঘুটা, গারতলি, নোনাই, গিলাণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন ছোট ছোট নদীগুলোর জলধারায় সৃষ্ট ও পুষ্ট

ডুডুয়া নদী প্রায় ৩৫ কিমি পথ অতিক্রম করে ধুপগুড়ি ব্লকের জুড়াপানি (যেখানে গিলাণ্ডী নদী মিশেছে ডুডুয়াতে) ও বালাসুন্দর (ফালাকাটা) অতিক্রম করে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমায় প্রবেশ করেছে। ধুপগুড়ি ব্লকের গাদং-১ ও গাদং-২ এর সাথে কাজিপাড়া ও ঝাড়শাল বাড়ি এলাকার জনগণকে কালাপানির ঘাট পারাপার করতে হত ধুপগুড়ি ও ওমকেশ্বরের ঘাটে যাওয়ার জন্য।

কাছারির ঘাট

অতীতে ডুয়ার্সের বড় জোতদার ও জমিদারদের বিশ্রাম বা অতিথি সম্ভাষণের জন্য 'ডারিঘর' ছিল তেমনই খাজনা আদায় সংক্রান্ত কাজ করবার জন্য ছিল 'কাছারি ঘর'। বর্তমান ১ নং গাদং পঞ্চায়েত অফিসের ২/৩ কিমি পূর্বে গাদং নদীর ডুডুয়াতে মিলন স্থানের কাছে সুধীরচন্দ্র রায় নামক এক প্রভাবশালী বিত্তবানের কাছারি ঘর ছিল। কাছারি ঘরের নিকটেই ছিল নদী পারাপারের ঘাট। তাই এই ঘাটের নাম হয় কাছারির ঘাট। সমাজতাত্বিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই ঘাটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সে সময় ডুডুয়া ছিল আরও বিস্তৃত ও গভীর। কাছারি ঘাটটি শালবাড়ি ও জটেশ্বরের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম পথ ছিল। সেকালে বড় হাট বসত জটেশ্বরে। সপ্তাহে দু-দিন— শনি ও মঙ্গলবার। কাছারি ঘাট থেকে জটেশ্বরের হাটের দূরত্ব প্রায় ৫/৬ কিমি। যানবাহন বলতে গোরু বা মোষের গাড়ি। ঘাটে লোক পারাপারে ব্যবহৃত হত 'সোলভা' নৌকা (এক নৌকা)। মাড়ের নৌকা ব্যবহৃত হত মূলত গোরু, ছাগল, মোষ, মালপত্র, গোরু বা মোষের গাড়ি পারাপারের জন্য। সাধারণত হাটবার গুলোতেই মাড়ের নৌকা ব্যবহৃত হত। সে সময় হাটুরেরা দলবদ্ধভাবে হাটে যাতায়াত করত পথে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অতীতে কাছারি ঘাটের ঘাটিয়ার ছিল বিহারের বাসিন্দা চৌধুরী পরিবার। বংশানুক্রমে ঘাটিয়ার বা ঘাটোয়ালের কাজ করেছিলেন দীর্ঘকাল। সে সময় দৈনিক মাশুল ছাড়াও বাৎসরিক মাশুলেরও প্রচলন ছিল। সাধারণত পরিচিত হাট যাত্রীরা হাট ফিরানীতে মাশুল দিত। পয়সা ছাড়াও ধান, চাল, শস্য ধান ইত্যাদি দিয়ে ঘাটের মাশুল মেটানোর রীতিও ছিল। প্রচলিত ভাওয়াইয়া গানের কাছারি ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়—

আরে ও কাছারি ঘাটের ওরে নাইয়া,
দ্যাওয়ার ভিতি
চায়া দেখিয়া দ্যাও বাদাম তুলিয়া নাইয়ারে।

আজি ঐ দেখা যায় শ্বশুর বাড়ি আরে ও রে নাইয়া
কাঠোল সুপাড়ি, ভিনা দেহা ভিজা কাপড়
চলিনু মুই নাইয়ারে—।
আজি হাড়িয়া কোনাও ম্যাঘ নাগাইছেবে
আরে নাইয়া তোলাইল পুবাল বাও
পারের কড়ি বুঝিয়া নিয়া ঘাটে চাপাও
নাইয়ারে।

ধাউরার ঘাট

নদীর নাম বিরকিটী। ছোট্ট নদী। বর্ষাকালে খরস্রোতা। এই নদীর ধারে ধাউরা (রাজবংশী) এক ব্যক্তির বাড়ি ছিল। বাড়ির কাছেই ছিল একটি ঘাট। ঘাটটি লোকমুখে ধাউরার ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ঘাটের ঘাটিয়ার ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের কান্দুরা রায়। ঘাটের ওপরে পালো জুড়া বান্দা ঠাকুর। জুড়াবান্দা পথের দেবতা। রাস্তা বা পথেই এর থান। মান্যতা হিসাবে গাছের ডালে 'জুড়া' অর্থাৎ পাট বা খড়-তৃণ পেঁচিয়ে পুটলি করে ঠাকুরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। পথের দেবতা 'জুড়াবান্দা' হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে পথ যাত্রীদের রক্ষা করতেন বলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস। থানটি এখনও বর্তমান। ধাউরার ঘাটটি ফালাকাটা থানার গুয়াবর নগর অঞ্চল থেকে প্রায় ২ কিমি উত্তরে অবস্থিত। ঘাট পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটা পথে বা গোরুর গাড়িতে ক্ষিরার কোট হয়ে মুজনাই নদীর অন্য একটি ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যেত। এই ঘাটের কাছেই একটি নদীর 'ছাড়া' ছিল। ছাড়াটির মালিক ছিল জঞ্জালু রায়। ছাড়াটির নাম 'ঠ্যাং ধোয়ার ছাড়া'। এই ছাড়াটির ঠাকুরের থানে ২টি সেন্দুর পড়ানো 'গুঁহি' ছিল। এই থানে ভক্তি না দিয়ে যাত্রা করা বা বিলের জলে মাছ ধরতে নামলে ঠাকুর ধরত। তার সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরা হত না।

গোলকের ঘাট

নদীর নাম জলঢাকা। জদ্‌ধোকা ➝ জলঢাক্কা ➝ জলঢাকা। জলঢাকা নদীর এটি প্রাচীন ঘাট। বাবোঘবিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত। জলঢাকা নদীর এই ঘাট ধুপগুড়ি, ফালাকাটা, শালবাড়ির লোকেদের মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা, রানির হাট, জামালদহ ইত্যাদি স্থানের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম পথ ছিল। এই ঘাট পেরিয়ে ধুলিয়া মেলায় প্রচুর লোকের সমাগম হত। জলঢাকা বা জদ্‌ধোকা (নদী) ঠাকুর আছে। লোকদেবতা। গারাম থানে পূজা হয়। জলঢাকা ঠাকুরের বাহন বাঘ। ঘন জঙ্গলে বাঘের ভয় ছিল বলে নদী দেবতা জলঢাকার বাহন 'বাঘ' রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। জলঢাকা বর্ষাকালে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। ঘাটে নদী পারাপারে 'মাড়ের নৌকা' ব্যবহার হত। 'গোলক' নামে একজন ঘাটিয়ার ছিলেন। যেহেতু ঘাটিয়ার ও ঘাটের মালিক ছিলেন 'গোলক' নিজেই। সেই কারণে ঘাটটি তার নামে পরিচিতি লাভ করে।

বার্ণেশ ঘাট

বার্ণেশ ঘাট তিস্তার একটি অতি প্রাচীন ঘাট। এই ঘাটই ডুয়ার্সের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। একদা জলপাইগুড়ি শহরের কিং সাহেবের ঘাটের সঙ্গে বার্ণেশ ঘাটের যোগাযোগ ছিল। তিস্তা নদীতে যেমন ফেরি ব্যবস্থা ছিল তেমনই তিস্তার চরে চলত 'চর ট্যাক্সি'। প্রতিদিন এই ফেরি ঘাটের সাহায্যে প্রচুর লোক যাতায়াত করত। ঘাট সংলগ্ন একটা প্রাচীন কালীন মন্দির ছিল। বার্ণেশে একটি বড় বাজার বসত আর ছিল বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেল স্টেশন। বার্ণেশ এর ওপর দিয়ে চাংরাবান্দা হয়ে লালমণির হাট অবধি রেলপথে (এম জি) যোগাযোগ ছিল। এখানে বার্ণ সাহেবের একটি কুঠি ছিল। তার নামানুসারে এই ঘাটের নামকরণ। বার্ণ (জনৈক ইংরেজ সাহেব) > বার্ণশ > বার্ণিশ।

জলদাপাড়া ঘাট

ডুয়ার্সের সংকোশ নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। কুমারগ্রামের ৭/৮ কিমি উত্তরে সংকোশ নদীতেই একটি ঘাটের নাম ৮নং ঘাট। যে ঘাটটি অসম-ভুটান ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। এই ৮ নং ঘাটের ৪/৫ কিমি দক্ষিণে জলদাপাড়া ঘাট। উত্তর হলদিবাড়ির একটি অংশ হল

জলদাপাড়া, 'জলদা' একটি আদিম জনগোষ্ঠী। জলদা জনগোষ্ঠীর বসবাস বলেই স্থান নাম হয়েছে 'জলদাপাড়া'। প্রায় ১৫/২০টি পরিবার এখানে বাস করত। জলদাদের মূল পেশা ছিল মাছ ধরা, লাঙ্গল, জোয়াল ছাম-গাইন ইত্যাদি তৈরি করা। বর্তমানে জলদারা আর নিজেদেরকে জলদা বলে পরিচয় দিতে চায় না। এঁরা সূত্রধর, সুতার ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করে থাকেন। জলদা জনগোষ্ঠীর লেকু-সুতার-এর পরিবার জলদাপাড়ার দক্ষিণে বসবাস করছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে নেপালিদের প্রভাব বেড়েছে। জলদাপাড়া ঘাট পেরিয়ে আসাম বস্তি। স্থানটি জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বে এর নাম ছিল 'চাড়ালের ভাণ্ডার'। মূলত দহলা জায়গা ছিল। প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। যারা মাছ ধরত তাদেরকে 'চাড়াল' বলা হত। দহলায় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত বলে জলদারা ঝকা, ঝাপি, জাল প্রভৃতি নিয়ে মাছ ধরতে যেত ঘাট পেরিয়ে। সারা বছরই ঘাট পারাপার চলত। গ্রামের সকলে মিলে শ্রম বা অর্থ দিয়ে নৌকা বানাত। একজন ঘাটিয়ারকে নিয়োগ করা হত এবং তার সারা বছরের পাওনা মেটানো হত ধান বা শস্য দ্রব্য দিয়ে। ঘাটটি কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উত্তর হলদিবাড়ি মৌজার অর্ন্তগত। উল্লেখ্য মাদারীহাট ব্লক-এর অন্তর্গত জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে অতীতে 'জলদা' জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। সে কারণেই এই অভয়ারণ্যের নাম যে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

বিত্তিবাড়ির ঘাট

নদীর নাম সংকোশ। জলদাপাড়া ঘাট থেকে একটু দক্ষিণে এই ঘাট। 'বিত্তি' শব্দের দু'রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'বিত্তি' এক অর্থে গাছ (তিতা গাছ)। ধুতরা গাছের মতো দেখতে। ছোট ছোট পাতা হয়। ফলও হয় ছোট্ট গোলাকার। রাজবংশীরা 'ছ্যাকা' (তরকারী) খাওয়ার জন্য বিত্তি গাছের পাতা সংগ্রহ করতেন। এতদঞ্চলে বিত্তি গাছ জন্মাত প্রচুর। যে কারণে বিত্তি বাড়ির ঘাট নামকরণ হয় বলে মনে করা হয়। আবার অন্য অর্থে 'বিত্তি' হল এক প্রকার ধান। মোটা ধান। মোটা চাল হয়। খেতে সুস্বাদু নয়। দেশ বিভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য লোক এসে বসতিস্থাপন করে ও বিত্তি ধানের চাষ শুরু করে। এখানে প্রচুর 'বিত্তি' ধানের ফসল হত বলে স্থাননাম ও ঘাটের নাম হয় 'বিত্তি বাড়ির ঘাট'। এতদঞ্চলের লোকেরা এই ঘাটের মাধ্যমে কুমারগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। কুমারগ্রামের হাটে যেত হাট করতে। হাট বসত বুধবার। কয়েক বছর আগেও ঘাট পারাপার চালু ছিল। ঘাটিয়ার ছিলেন অতুল বর্মণ। কুমারগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে সংকোশ নদীতে এটিই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। এই ঘাটের সরকারি ডাক হত না। বেসরকারি ভাবে সাধারণ মানুষেরাই পরিচালনা করতেন।

ঘরঘরিয়া ঘাট বা ঘটঘটিয়া ঘাট

করতোয়া নদীর অন্যতম একটি প্রাচীন ঘাট। আমবাড়ি-ফালাকাটায় (বর্তমান ব্যারাজের উত্তর দিকে) এই ঘাট ছিল। এখানে ছোট নৌকা, মাড়ের নৌকা ছাড়াও বজরা চলাচল করত এই করতোয়ার ঘাটে। করতোয়ার ঘাটে দেবী চৌধুরানির বজরা পাওয়া গিয়েছে বলে শোনা যায় লোকমুখে। করতোয়া, তিস্তার বিভিন্ন ঘাটে দেবী চৌধুরানির বজরার নোঙর বাঁধা হত তা কারও অজানা নয়। অতীতে ঘরঘরিয়া ঘাট বৈকুণ্ঠপুরের সঙ্গে ও শিলিগুড়ির সঙ্গে নৌপথে ও স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।

চকচকা ঘাট

গচিমারি নেমে মাত্র ৩ কিমি দক্ষিণে ইছল চকচকা ঘাট (চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত) রায়ডাক নদীতে। গ্রামের নাম চকচকা। ৩১ নং জাতীয় সড়কের বর্তমানের রায়ডাক সেতু যেখানে, সেখানেই ছিল চকচকা ঘাট। রায়ডাক সেতু পেরিয়ে পশ্চিমে পশ্চিম চকচকা, তেলিপাড়া, ঘোড়ামারা ও কামাখ্যাগুড়ি। পূর্বে বারবিশা।

রুদ্রাক্ষপুরের ঘাট ঃ

'রাজগঞ্জ'-এর পূর্ব নাম রুদ্রাক্ষপুর। করতোয়া নদীর এই ঘাট একদিকে যেমন রাজগঞ্জ বা রুদ্রাক্ষপুরের সঙ্গে অন্যদিকে মাঝিয়ালির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত। গোরুর গাড়ি ও মোষের গাড়ি ও নৌকায় পারাপার করা হত।

ছাওয়া ফেলার ঘাট

ছাওয়া শব্দের অর্থ 'সন্তান'। রাজবংশী ভাষার শব্দ। এই ঘাটটি গাদং অঞ্চল থেকে ৪/৫ কিমি উত্তর-পূর্বে। নদী ডুডুয়া। ঘাটিয়ারের নাম— রবিরাম, নেলটেং, ওমানিয়া বুড়া। এই ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি লোকশ্রুতি আছে।— কোনও একসময় রাজবংশী বিধবা রমণীরা হটেশ্বর হাট করে ফিরবার সময় হঠাৎ ঝড় ওঠে। নৌকা তখন মাঝ নদীতে। নৌকা যখন ডুবুডুবু সে সময় তার ছোট শিশু সন্তান ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে। মা সন্তানকে সামলাতে না পেরে ক্রোধে জলে ফেলে দেওয়ার কথা বলে। ঝড় আরও প্রবল আকার ধারণ করে এবং নৌকা প্রায় ডুবন্ত— তখন অন্যান্য যাত্রীরা তাকে উদ্দেশ করে বলে, তার জন্য এরকম পরিস্থিতি হয়েছে। সে তার সন্তানকে নদীতে ফেলে দিতে চেয়ে অন্যায় করেছে— ফলে নদী দেবতা রুষ্ট হয়েছে। সুতরাং দেবতাকে সন্তান উৎসর্গ না করলে যাত্রীবোঝাই নৌকার সলিল সমাধি ঘটবে। কোনও উপায়ন্তর না দেখে সেই বিধবার শিশু সন্তানকে দেবতার উদ্দেশে জোর করে নদীর জলে ফেলে দেয়। নদী শান্ত হয়। ঝড় থেমে যায়। যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে যায়। তখন থেকেই এই ঘাটের নাম হয় 'ছাওয়া ফেলা ঘাট'।

ডুয়ার্সের পথঘাটের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে স্থানীয় লোক সমাজ। যেমন— কোচ, মেচ, রাভা, গারো, রাজবংশী, মুন্ডা, সাওপল ইত্যাদি। নদী-পথঘাট গুলির সীমাক্ষার মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলের একটি আর্থ-সামাজিক পরিচয় ফুটে ওঠে অর্থাৎ কৌমজীবনাচারণের নানা দিক নদী-পথ-ঘাট-ঘাটিয়ারের মধ্যে নিহিত আছে। বিভিন্ন ফেরী ঘাট বা ঘাটের ঘাটিয়াররা শুধুমাত্র পারাপার-ই করতেন না। পারাপারের সঙ্গে পথযাত্রী, হাটুরে, গাড়িয়াল, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে জনসংযোগের কাজটিও করতেন। অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনির প্রবহমানতা ঘাটিয়ার লোক সমাজ। জনসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে লোক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঘাটিয়ারদের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। কোনও স্থানে কোনও ঘটনা ঘটলে তারা পথচারীকে জানিয়ে দিতেন। এটিই ছিল লোকাচার। স্থান বিশেষে তাঁরা নাইয়া, ঘাটিয়ার, ঘাটিয়াল প্রভৃতি নামে পরিচিত। আধুনিক প্রযুক্তিতে সেতু বন্ধনের ফলে ঘাট আর ঘাট থাকছে না নতুন নাম নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন সেতু। হারিয়ে যাচ্ছে ঘাট-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য।

দিলীপ বর্মা

পাঠকের পরিক্রমা

রোজকার রুটিনের বাইরে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়লে মন ভাল থাকে, স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। সব সময়ে যে টুরিস্ট স্পটেই যেতে হবে তা না একটু দূরে কোথাও বাসে গাড়িতে কোনও গ্রামে বা কোনও নদীর ধারে কিংবা কোনও পার্কে বা কোনও গ্রামীণ হাটে— যেখানেই হোক না ছবি তুলুন আর ফিরে এসে সেই সব ছবির সঙ্গে দুকলম লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের। আমরা ছাপব আপনার বেড়ানোর ছবি-গল্প।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১০। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-4 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.